ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৮ সংখ্যা : ৩০
এপ্রিল-জুন : ২০১২

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

# ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা



বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

**ইসলামী আইন ও বিচার**
বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৩০

**প্রকাশনায়** : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
**এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

**প্রকাশকাল** : **এপ্রিল-জুন** : ২০১২

**যোগাযোগ** : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

**সম্পাদনা বিভাগ** : ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৭১২-০৬১৬২১
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

**বিপণন বিভাগ** : ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

**সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং**
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

**প্রচ্ছদ** : আন-নূর

**কম্পোজ** : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
**দাম** : ১০০ টাকা US $ 5

---

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

# সূচিপত্র

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩০
এপ্রিল-জুন : ২০১২

## সম্পাদকীয়

## গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের আইন ও নাগরিকদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিধান

নাগরিকদের স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও বিশ্বসমাজের স্বতঃসিদ্ধ রীতি পদ্ধতিও মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সুরক্ষা ও নিশ্চিত করার পক্ষে। উন্নত বিশ্বে রাষ্ট্র নাগরিকদের ধর্মীয় বিধানকে চ্যালেঞ্জ করে না। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকেরা তাদের ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইসলামে বিশ্বাসী নাগরিকগণও ধর্মীয় স্বাধীনতার সুবাদে উন্নত দেশসমূহে শরীয়তের বিধান পালনের সুযোগ পেয়ে থাকেন। পাশ্চাত্যে মানবাধিকারের অবাধ চর্চার ফলে শরীয়া পালনে মুসলিমরা সহজেই আইনি সহায়তাও পেয়ে যান।

ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা থাকা অবস্থায়ও ব্যক্তি পরিবার ও সমাজজীবনে মুসলিম এবং হিন্দু সমাজ স্ব স্ব ধর্মীয় বিধান পালনের সুবিধা ভোগ করে। দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থা শরীয়া আইনে পরিচালিত হলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব রীতিতে ধর্ম সংস্কৃতি ও জীবনাচার পালন করেছেন। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নীতিও এ কর্মধারারই সমর্থক।

আইনের পরিভাষায় ব্যক্তি পরিবার ও সমাজজীবনের স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ বিধি-বিধানকে 'পার্সোনাল ল' বলা হয়ে থাকে। 'ফ্যামিলি ল' বলে আখ্যায়িত বিধি-বিধানও এর মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশে 'পারিবারিক আইন' যেসব বিষয়কে আওতাভুক্ত করে, ভারতে সে সবই 'পার্সোনাল ল' হিসেবে অভিহিত।

বৃটিশ উপনিবেশিক আমলে 'হিন্দু আইন' বলতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণের পারিবারিক আইন যেমন স্বতন্ত্র ছিল, 'মুসলিম পারিবারিক আইন' নামে মুসলমানদের একান্ত আইনগুলোও ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সুরক্ষিত। নানা সময়ে হিন্দু আইন সংস্কারের কথা ওঠলেও রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। গোটা হিন্দুসমাজ একমত হলে হয়ত কোন সংস্কার কার্যকর হয়েছে। অন্যথায় ধর্মীয় বিধান সুরক্ষার জন্যে প্রতিবাদী

নাগরিকগণের অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে পরিবর্তন বা সংস্কার চিন্তা বাদ দেয়া হয়েছে। যে জন্য বিবাহ নিবন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার আইনে হিন্দু নারীর অংশ, সম্পত্তি দান বা হেবা ইত্যাদি বিষয়ে এখনো পর্যন্ত ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। সরকার এনজিও হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ এক ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন শোনা গেলে, রক্ষণশীল ধর্মপ্রাণ হিন্দু নাগরিক বা সংগঠনের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ চলে আসে, যা খুবই স্বাভাবিক এবং মানবাধিকার সম্মত। সাংবিধানিক দিক দিয়েও এ ধরনের দাবি সমর্থিত। এ উপমহাদেশে কোন কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রগতিশীল ও আধুনিকপন্থী দাবি করে এবং ধর্মীয় বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে 'সকল নাগরিকের জন্য একই আইন' নীতির বাস্তবায়নে জোর দিতে চান। কিন্তু তাদের এ কর্মপন্থা যৌক্তিক বা মানবাধিকারবান্ধব নয়।

সম্প্রতি বিবাহ আইনে হিন্দু মুসলিম বা বিভিন্ন ধর্মের লোকদের আন্তঃবিবাহের সুযোগ ও নতুন করে এ ধরনের বিয়ের কাজী নিয়োগে জনমনে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের রীতি বিরোধী। এ ধরনের বিধান রহিত করতে হবে। অন্যথায় সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। নতুন বা পুরনো অসঙ্গত সকল সিদ্ধান্ত থেকে সরকারকে ফিরে আসতে হবে।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ও নাগরিকদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন ধর্মহীন হয়ে যায় না। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও কার্যক্রমই কেবল সেখানে ধর্মীয় পক্ষপাতমুক্ত হয়ে থাকে। সেকুলার রাষ্ট্রে নাগরিকদের ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মীয় আচার পরিপালন নিষিদ্ধ করার নিয়ম নেই। কেবল নাস্তিক্যবাদী কট্টর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই ধর্মকে আফিম বলা হয়।

সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ হিন্দু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেছেন যে, 'আইন তৈরির সময় সরকার কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত দেবে না। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের মতামত নিয়েই আইন করা হবে'।

বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ নাগরিক ইসলামে বিশ্বাসী। তাদেরও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান শরীয়তসম্মত উপায়ে পালনের সুযোগ থাকা চাই। শরীয়ত নির্ধারিত ও অলংঘনীয় ধর্মীয় বিধি-বিধানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কোন বিকৃতি বা পরিবর্তন যেন কোন ক্রমেই সংঘটিত না হয়। বিগত দিনে যে সব বিধানে কুরআন-সুন্নাহর বিধি লংঘিত বা বিকৃত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন,

সংশোধনী দিয়ে রেখেছেন, বর্তমানে সেসব গুরুত্ব ও আন্তরিকতা সহকারে পুনর্মূল্যায়ন করা সময়ের সেরা কর্তব্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে যেমন এ উদ্যোগটি বিশেষভাবে সমাদৃত হবে, সচেতন মুসলিম নাগরিক সমাজেও এটি হবে ঐতিহাসিক ভাবে নন্দিত ও প্রশংসিত।

অতিসম্প্রতি রাজধানীতে অনুষ্ঠিত 'ছেলে সন্তানের অবর্তমানে উত্তরাধিকার সম্পদে মেয়ে সন্তানের পূর্ণ অধিকার' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেছেন, 'উত্তরাধিকার সম্পদে মেয়ের অধিকার নিশ্চিত করতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই সংশোধনী ছেলেসন্তানের অবর্তমানে বাবার সম্পদে মেয়েসন্তানের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতিতে যেন আঘাত না আসে সে দিকে নজর রাখা হবে। ৬১ সালের আইনটি সংশোধনে আলেমদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবে সরকার'।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের পারিবারিক আইন মূলত শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত। এর কোন কোন অংশ অপরিবর্তনীয় এবং চূড়ান্ত। শরীয়তের অনেক বিধান এমনও আছে যাকে ঠিক আইন বলা যায় না। এগুলো উপদেশ বা নির্দেশনা ধরনের বিধান। এ সব বিবেচনায় রেখে পারিবারিক আইন তথা পার্সোনাল ল' এর পরিমার্জনে ধর্মীয় অনুভূতি আহত না করা এবং আলেমদের সাথে আলোচনা অপরিহার্য। তবে এখানে আইন প্রণেতাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একজন মুসলিমের পক্ষে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চূড়ান্ত নির্দেশ বা হুকুম না মানার কিংবা তাতে পরিবর্তন সাধনের কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন তোলা, বৈষম্য সন্ধান করা কিংবা মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে বিরূপ মত প্রকাশ করা ঈমান এবং ইসলামের পরিপন্থি। যেমন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নাগরিকদের আইন অমান্য, আদালত অবমাননা বা প্রকাশ্য দ্রোহকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না। মৌলিক কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম ও তার অনুসারীদের ভিন্নমত অবলম্বন, অবাধ্য হওয়া বা অমান্য করার অনুমতি দেয় না। যেমন, কোন রাষ্ট্র বা সমাজে সুদ ঘুষ মদ জুয়া দুর্নীতি অবাধ যৌনতা ইত্যাদি বৈধ হলেও সে সমাজে বসবাসরত মুসলিম নাগরিকদের জন্য সেসব বৈধ হয়ে যাবে না। এখানে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাকে দ্বৈত বিধানের মুখোমুখি হতে হবে। রাষ্ট্র এবং ধর্ম তাকে যখন দু'রকম নির্দেশনা দেবে; স্বভাবতই প্রকৃত মুসলমান তখন ধর্মীয়

বিধানকেই প্রাধান্য দিতে বাধ্য থাকবে। বিগত সময়ে অনেক কট্টর বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এভাবেই নিজ অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের ফলে প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিজের আনুগত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং আইন করেই একজন মুসলিমকে আইন না মানার পথে হাটতে বাধ্য করে। নাগরিকদের ধর্ম নৈতিকতা রীতি ঐতিহ্য বিলীন করে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও রাষ্ট্রের শক্তিমত্তা প্রতিষ্ঠার অস্বাভাবিক এবং অমানবিক এসব সিদ্ধান্তই মূলত বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এর বিপরীত। এখানে নাগরিকদের ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা হয়। সম্মান করা হয়। যে জন্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বহুধর্ম ও সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করেই শক্তিশালী এবং বিকশিত হয়। বাংলাদেশ উদার মধ্যপন্থী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ হিসেবে তার গণতান্ত্রিক অভীষ্ট পানে সঠিক পথ ধরে এগিয়ে যাবে, জনগণ এটাই আশা করে।

ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের প্রত্যাশাও এই যে, গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক আবহে রাষ্ট্রের আইন ও নাগরিকদের ধর্মীয় বিধান অতীতের মতই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদারতা ও প্রকৃতিসম্মত স্বাভাবিক অবস্থা অব্যাহত রেখে মানববিশ্বকে উজ্জ্বল আগামীর পথে তথা কাংখিত সাফল্য ও মুক্তির গন্তব্যের দিশা দেবে উদার মধ্যপন্থী বাংলাদেশ।

উবায়দুর রহমান খান নদভী

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩০
এপ্রিল-জুন : ২০১২

# ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে ইসতিহসান একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ রুহুল আমিন*
মারুফ বিল্লাহ নূর মুহাম্মদ**

*[সারসংক্ষেপ: বান্দার কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ ইসলামী বিধি-বিধান জারি করেছেন। মহানবী স.-এর ইনতিকালের মাধ্যমে রিসালাতের ধারা বন্ধ হলেও কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত প্রতিটি মানুষের জীবনের নানামুখি সমস্যার সমাধান ইসলামী আইনে পাওয়া যাবে। ইসতিহসান ইসলামী আইনের একটি সম্পূরক উৎস। ইসলামী আইনের মাযহাবসমূহ ইসতিহসানের ব্যাপারে যথারীতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, যেগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় এটি ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসতিহসান-এর পরিচিতি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি, মতভেদের কারণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা, তুলনামূলক ফিকহের মানদণ্ডে এর প্রামাণ্যতা যাচাইসহ সমসাময়িক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের সম্ভাব্যতা আলোচনার করা হয়েছে।]*

## ইসলামী আইনের উৎস

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রসূল স.-এর জীবদ্দশায় ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম ও ইসলামকে তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।”[১] এ আয়াত ইসলামের বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতির পূর্ণতার স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। আমাদের উপর মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস নির্ধারণ করেছেন, যার মাধ্যমে ইসলাম একটি গতিশীল, বিশ্বজনীন, নতুন নতুন ঘটনা প্রবাহে এগিয়ে চলা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্তকারী ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর রসূল স.-এর ইন্তিকাল ও ওহীর ধারা বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম যুগের

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, ফিকহ ও উসূলে ফিক্‌হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া।
** এল.এল.বি. (অনার্স), আইন অনুষদ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া।

১. আল-কুরআন, ৫:৩ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

বিবর্তনে আজও একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম।
ইসলামী আইনের উৎস দু'ভাগে বিভক্ত:
১. ওহীর উৎস অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস, যাকে নস হিসেবে নামকরণ করা হয়।
২. উৎস যা সরাসরি ওহী নয় অর্থাৎ ইজতিহাদী উৎস। যেমন ইসতিহসান, মাসালিহ মুরাসালাহ ও ইসতিসহাব ইত্যাদি।
কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম একমত হয়েছেন। একইভাবে তাঁরা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, এ চারটি উৎস ছাড়া ইসলামী আইনের আরো সম্পূরক উৎস রয়েছে। কিন্তু সে উৎসগুলো কী কী তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা মতভেদ করেছেন। ইব্‌নে সুবকী বলেন, "উসূলবিদগণ একমত হয়েছেন যে, উপরোক্ত উৎসসমূহ ছাড়া ও শরীয়তের আরো উৎস রয়েছে। কিন্তু তা নির্ধারণ করতে যেয়ে তারা মতবিরোধ করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন, ইসতিসহাব, কেউ ইসতিহসান, আবার কেউ মাসালিহ মুরাসালাহ। ইমাম শাফিঈ র. ইসতিসহাবকে, ইমাম মালিক র. মাসালিহ মুরসালাহ ও আবু হানীফা র. ইসতিহসানকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই একেকটিকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"[২]

ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসগুলো সত্তাগতভাবে আইনের কোন স্বতন্ত্র উৎস নয়, বরং এগুলো আইনের একটি রোডম্যাপ। একজন মুজতাহিদ যখন ইজমা ও কিয়াসের মধ্যে নতুন বিষয়ের কোন বিধান না পান তখন এর মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করতে পারেন। এরই ধারাবাহিকতায় ফকীহগণ ইসতিহসানকে ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

**ইসতিহসান-এর সংজ্ঞা**

**আভিধানিক অর্থ :** ইসতিহসান (استحسان) শব্দটি আরবী হুসনুন (حسن) শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার অর্থ উত্তম বা সুন্দর, যা খারাপের বিপরীত। সে হিসেবে ইসতিহসান অর্থ ভাল মনে করা ও উত্তম বিবেচনা করা।[৩] কোনো কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত

---

[২]. তাজ উদ্দীন আবু নসর আল-সুবকী, *রাফউ আল-হাজিব আন মুখতাসার ইব্‌ন হাজিব*, বিশ্লেষণ: শায়খ আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও শায়খ আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজুদ, বৈরূত: আলাম আল-কুতুব, ১৯৯৯, খ. 8, পৃ. ৪৮১-৪৮২
ان علماء الأمة أجمعوا على ان ثم دليلا شرعيا غير ما تقدم (القرآن والسنة والإجماع والقياس) واختلفوا في شخصيته، فقال قوم: هوالاستصحاب، وقوم الاستحسان، وقوم المصالح المرسلة ونحونلك... الشافعي يستدل بالاستصحاب، ومالك بالمصالح المرسلة وابوحنيفة بالاستحسان أي اتخذ كل منهم دليلا.

[৩]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৮০

হওয়াকেও ইসতিহ্সান বলা হয়।[৪] আবার বিশেষ কোনো অর্থ বা আকৃতি যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় বা পছন্দ করে তাকে ইসতিহ্সান বলে, যদিও তা অন্যের কাছে অপছন্দনীয় হয়।[৫] আল্লামা সারাখসী র. বলেন, আদিষ্ট বিষয় অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বনই ইসতিহ্সান।[৬] এ প্রসংগে মহান আল্লাহর বাণীঃ "যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শোনে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।"[৭] একইভাবে তিনি আরো বলেন, "নিজ জাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ গ্রহণের নির্দেশ দাও।"[৮]

**পারিভাষিক অর্থ :** ইসলামী আইনের নীতিমালা শাস্ত্রবিদগণ ইসতিহ্সানের বিভিন্ন পারিভাষিক সংগা প্রদান করেছেন। এ প্রসংগে কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংগা উল্লেখ করা হলো–

উসূল ফিকহের গ্রন্থে উল্লেখিত ইসতিহ্সানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন সংগায় বলা হয়েছে, "ইসতিহ্সান শরীয়তের এমন দলীল যা মুজতাহিদের অন্তরে প্রকাশ পায় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা জটিল।"[৯] ইমাম গাযালী র. যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না তাকে হতবুদ্ধিতা বলেছেন। কেননা যা যৌক্তিকতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায় না তা ভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। আর এ জাতীয় ভ্রম ইসলামী আইনের উৎস হতে পারে না।[১০]

---

৪. আলাউদ্দীন আবু বকর আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাই ফী তারতীব আল-শারাই*, বৈরূতঃ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬, খ. ৫, পৃ. ১১৮

৫. আবুল হাসান সাইফুদ্দীন আলী আল-আমাদী, *আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম*, টিপ্পনী সংযোজনঃ শায়খ আব্দুর রায্যাক আল-আফীফী, রিয়াদঃ মুআস্সাসাহ আল-নূর, ১৩৮৬, খ. ৪, পৃ. ১৫৭

৬. শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-সারাখসী, *উসূল আল-সারাখসী*, মিসরঃ মাতাবিই দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৩৭২, খ. ২, পৃ. ১৯০ (طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به)

৭. আল-কুরআন, ৩৯:১৮ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

৮. আল-কুরআন, ৭:১৪৫ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا

৯. (دليل ينقدح في نفس المجتهد وتعسر عبارته عنه) এটি উসূল ফিকহের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ আল-আমাদী, *আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৭; ইবনে হাজিব, জামালুদ্দীন আবু আমর, *মুখতাসার আল-মুনতাহা বিশরহ আল-আদাদ*, মিসরঃ আল-মাতবাআহ আল-আমীরিয়্যাহ, ১৩১৭, খ. ২, পৃ. ২৮৮; আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা ফী ইলম আল-উসূল*, বৈরূতঃ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩, খ. ১, পৃ. ১৭৩; আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মূসা আল-লাখমী আল-শাতিবী, *আল-ইতিসাম*, মিসরঃ আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৩২, খ. ২, পৃ. ১৩৬; মুহাম্মদ ইবনে আলী, আশ-শাওকানী, *ইরশাদ আল-ফুহুল ইলা তাহকীক আল-হাক্ক মিন ইলম আল-উসূল*, বিশ্লেষণঃ শায়খ আহমদ আযু, বৈরূতঃ দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৯৯৯, খ. ২, পৃ. ১৮১

১০. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা ফী ইলম আল-উসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৩

আল-মাওয়ারদী উল্লেখ করেন, "ইসতিহসান বলা হয় সাধারণ কিয়াস থেকে শক্তিশালী কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তনকে।"[১১] সংগায় বর্ণিত অর্থে ইসতিহসানকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কেননা উসূলে ফিকহের নীতিমালা অনুযায়ী দুটি কিয়াসের মধ্য থেকে শক্তিশালী কিয়াসটিই গ্রহণযোগ্য,[১২] তবে সংগাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা নসের ভিত্তিতে ইসতিহসান, ইজমার মাধ্যমে ইসতিহসান, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসতিহসানসহ ইসতিহসানের অন্যান্য প্রকারগুলো এ সংগা থেকে বাদ পড়ে যায়।

ইমাম আল-শাতিবী র. বলেন, সামগ্রিক দলীলের বিপরীতে আংশিক জনস্বার্থ বা কল্যাণকে গ্রহণই ইসতিহসান।[১৩] পূর্বোক্ত সংগাগুলোর তুলনায় এ সংগাটি ব্যাপকতা অন্তর্ভুক্ত করে ঠিকই কিন্তু এটি মালিকীগণের দৃষ্টিতে ইসতিহসানের যথার্থ সংগা নয়। কেননা তাদের দৃষ্টিতে ইসতিহসান মূলত মাসালিহ মুরসালার বিভিন্ন ধরনের একটি।[১৪]

### বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিতে ইসতিহসান

**ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন মাযহাব ইসতিহসানের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে ইসতিহসানের ব্যাপারে মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো –**

**ক. হানাফী মাযহাবঃ** অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় এ মাযহাব ইসতিহসানের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবনে প্রসিদ্ধ। এমনকি এই প্রসিদ্ধ উক্ত মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা র. ও তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সহচর যথাক্রমে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-শায়বানী ও আবূ ইউসূফসহ এ মাযহাবের অন্যান্য মুজতাহিদগণ ইসলামী বিধান নির্গমনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা র.-এর সতীর্থরা কিয়াসের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করতেন, তাঁদের কেউ তা যথার্থভাবে উপস্থাপন করতেন আবার কেউ যথাযথভাবে করতেন না। অবশেষে যখন তিনি বললেন, ইসতিহসান কর, তখন কেউ আর বিতর্কে জড়িয়ে পড়তেন না।[১৫]

---

[১১]. আবুল হাসান আলী আল-মাওয়ার্দী, *আদাব আল-কাযী*, বিশ্লেষণঃ মহী হিলাল আল-সারহান, বাগদাদঃ মাতবাআহ আল-ইরশাদ, ১৯৭১, খ. ১, পৃ. ৬৫০ (العدول عن قياس إلى قياس أقوى)

[১২]. জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, আল-মুহাল্লী, *শরহ মিনহাজ আল-তালিবীন লিল নাবভী বিহাশিয়্যাতাই কালউভী*, মিসরঃ মাতবাআহ ঈসা আল-বাবী আল-হালবী, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৩৫৩

[১৩]. ইমাম আল-শাতিবী, *আল-মুয়াফাকাত ফী উসূল আল-শরীয়া*, বিশ্লেষণঃ শায়খ আব্দুল্লাহ দিরাজ, মিসরঃ আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ২০৬; *আল-ইতিসাম*, খ. ২, পৃ. ১৩৮ الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

[১৪]. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০৬

[১৫]. ইসমাঈল, শাবান মুহাম্মদ, *আল-ইসতিহসান বাইনা আল-নাজরিয়াহ ওয়া আল-তাতবীক*, দোহাঃ দার আল-সাকাফাহ, ১৪০৮, পৃ. ৩৫

হানাফী মাযহাবের ইমাম আবুল হাসান আল-কারখী প্রদত্ত ইসতিহ্সানের সংগাকে প্রণিধানযোগ্য গণ্য করা হয়। কেননা তাঁর সংগায় মাযহাবের নিকট বিবেচ্য ইসতিহ্সানের সব দিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, "কোন মাসআলার ক্ষেত্রে তার সমকক্ষ ও সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলায় প্রদত্ত বিধানকে বাদ দিয়ে তার বিপরীত বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এ কারণে যে, উক্ত প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর বেশি।"[১৬]

ইমাম যাইলায়ীর মতে, হানাফী মাযহাবে ইসতিহ্সান নিম্নোক্ত দুই অর্থের কোনো এক অর্থ বর্হিভূত হবে না। প্রথমত : যে সব বিষয়ের পরিমাপ বা পরিমাণ নির্ধারণ করার দায়িত্ব স্বয়ং মুজতাহিদের উপর ন্যস্ত, ইজতিহাদ ও নিজস্ব মতামতের আলোকে সেটি নির্ধারণ করা। যেমন তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দতকালীন প্রদেয় বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ। এ বিষয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় হলো, স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ। মহান আল্লাহ বলেন, "আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, যদি দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী (পিতার) দায়িত্ব ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে সেই নারীর খোরপোষ প্রদান করা।"[১৭] কিন্তু ইজতিহাদ ছাড়া ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ নির্ধারণ করার কোন উপায় নেই। আমাদের নিকট ইজতিহাদের এ ধরনই ইসতিহ্সান নামে খ্যাত। দ্বিতীয়ত : কিয়াসের চেয়ে অগ্রাধিকারগণ্য দলীল প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে কিয়াস পরিত্যাগ করা, যেন মাসআলাটির এমন একটি শাখা থাকে যা দুটি মূলনীতি নিজেদের থেকে সাদৃশ্য গ্রহণের জন্য আকর্ষণ করে। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ একটিকে গ্রহণ ও অন্যটি বর্জন করতে হবে।[১৮]

হানাফীগণ নসের ভিত্তিতে সাধারণ কিয়াসের বিপরীতে ইসতিহ্সান প্রয়োগ করেন। যেমন রোযা অবস্থায় ভুলক্রমে কিছু খেলে কিয়াস রোযা নষ্ট হওয়ার দাবি করে। কেননা ভুলবশত আহারকারী "অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত"[১৯] এ আয়াতে বর্ণিত রোযা পরিপূর্ণ হওয়ার শর্ত পূরণ করেনি। কিন্তু রসূল স.-এর বাণী "যদি কেউ

---

[১৬]. আলাউদ্দীন আব্দুল আযীয ইব্নে আহমদ আল-বুখারী, *কাশফ আল-আসরার আন উসূল ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদাভী*, বৈরূতঃ দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৯৭৪, খ. ৪, পৃ. ৩ العدول في مسئلة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى يقتضي هذا العدول

[১৭]. আল-কুরআন, ২:২৩৩ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[১৮]. ড. আজীল জাসিম আল-নাশমী, আল-ইসতিহ্সান হাকীকাতুহু ওয়া মাযাহিব আল-উসূলিয়্যাহ, *জার্নাল অব শরীআহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ*, কুয়েতঃ কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ১৪০৪, পৃ. ১১৩

[১৯]. আল-কুরআন, ২:১৮৭ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

ভুল করে খায় ও পান করে সে যেন রোযা পূর্ণ করে, কেননা আল্লাহ তাকে পানাহার করিয়েছেন"[২০] এ নসের ভিত্তিতে কিয়াসের দাবি পরিত্যাগ করার মাধ্যমে ইসতিহসান করা হয়েছে। এ প্রকৃতির ইসতিহসানকে 'ইসতিহসান শারিঈ' (استحسان الشارع) বলা হয়, যা মূলত শরীয়তসম্মত কল্যাণকে নসের উপর এবং কিয়াস ও নসের বৈপরিত্যের সময় নসকে অগ্রাধিকার প্রদান করাকে বুঝায়। এ জাতীয় ইসতিহসানের উপর কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কিয়াসের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত ও সম্পৃক্ত অর্থবোধক হলে কোনো কোনো সময় তা 'ইসতিহসান শারিঈ' এর উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়। যেমন ইহরাম অবস্থায় শিকার বা প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হবে তা ব্যতীত। তবে ইহরাম বাধাঁ অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না।"[২১] কিন্তু মহানবী স. কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর-এ পাঁচ শ্রেণীর ক্ষতিকারক প্রাণীকে আল্লাহর বাণীতে উল্লেখিত সাধারণ নির্দেশের বহির্ভূত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।[২২] আর এই 'ইসতিহসান শারিঈ' এর উপর কিয়াস করে সাপ, বাঘ ও চিতাকে উক্ত পাঁচ প্রকারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।[২৩]

**খ. মালিকী মাযহাবঃ** জনস্বার্থ বাস্তবায়ন, শরীয়তের নীতিমালা সংরক্ষণ, বিধান সহজিকরণ ইত্যাদি কারণে ইমাম মালিক র. ও তাঁর মাযহাবের অন্যান্য মুজতাহিদ ইসতিহসানকে বিধান প্রণয়নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইসতিহসান বিষয়ে ইমাম মালিকের বিখ্যাত উক্তি "ইসতিহসান ইলমের দশ ভাগের নয় ভাগ"।[২৪] আসবাগ ইবনে ফারায ইসতিহসানকে ইলমের স্তম্ভ গণ্য করে একে কিয়াসের উপর প্রাধান্যযোগ্য ঘোষণা দিয়েছেন।[২৫]

---

[২০]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-সাওম, অনুচ্ছেদ : আল-সাইম ইজা আকালা আও শারাবা নাসিআন, বৈরূত : দারু ইবনে কাসীর, ১৪০৭, হাদীস নং- ১৮৩১ إذا نسي فلكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه

[২১]. আল-কুরআন, ৫:১ احِلَتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ

[২২]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, অনুচ্ছেদ : মা ইয়াকতুলু আল-মুহরিম মিন আদ্‌দাওয়াব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৭৩২
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداة والعقرب والفأرة والكلب العقور

[২৩]. হাসবুল্লাহ আলী, *উসূল আল-তাশরীঈ আল-ইসলামী*, বৈরূতঃ দার আল-ফিকর আল-আরাবী, ১৯৯৭, পৃ ২০৬

[২৪]. ড. ইয়াকুব ইবনে আব্দুল ওয়াহাব, *আল-ইসতিহসান হাকিকাতুহু ওয়া আনওয়াউহু, হুজ্জিয়্যাতুহু তাতবিকাতুহু, আল-মুআসারাহ*, রিয়াদঃ মাকতাবাহ আল-রুশদ, ২০০৮, পৃ. ৫০

[২৫]. ইমাম আল-শাতিবী, *আল-মুয়াফাকাত ফী উসূল আল-শরীআহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০৯

এ মাযহাবভুক্ত ইমাম ইবনুল আরাবী দলীলের চাহিদাকে বাদ দিয়ে বিকল্প ও বিশেষ অনুমতি হিসেবে ইসতিহ্সানকে গ্রহণ করেন এবং এ প্রসংগে তিনি চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেন: ১. উরফের (সামাজিক প্রথা) সাথে কিয়াস সাংঘর্ষিক হলে, ২. মাসলাহার (জনকল্যাণ) সাথে কিয়াস সাংঘর্ষিক হলে, ৩. ইজমার সাথে কিয়াস সাংঘর্ষিক হলে এবং ৪. কষ্ট লাঘব ও সহজিকরণের সম্ভাবনা থাকলে।[২৬]

ইসতিহ্সানের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে ইমাম মালিক র. শুধু মাসলাহার সাথে একে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে পরবর্তীতে মালিকী মাযহাবে উরফের মাধ্যমে ইসতিহ্সান (الاستحسان بالعرف), প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসতিহ্সান (الاستحسان بالضرورة) ও জনস্বার্থে ইসতিহ্সান (الاستحسان بالمصلحة) বিশেষ প্রাধান্য পায়।[২৭] ইমাম আল-শাতিবী ইসতিহ্সানকে বান্দার কর্মের উদ্দেশ্য সংরক্ষণের উত্তম পদ্ধতি গণ্য করে মুফতীকে ফাতওয়া প্রদানের সময় এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করেছেন।[২৮]

গ. শাফিঈ মাযহাব: সামগ্রিকভাবে ইমাম শাফিঈ র. ইসতিহ্সানকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেননি বরং তিনি এ অনুযায়ী বিধান প্রণয়নের বিরোধিতা করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ "আল-উম্ম" গ্রন্থে ইসতিহ্সানকে বাতিল সাব্যস্ত করে إبطال الاستحسان (ইসতিহ্সান বাতিল সাব্যস্তকরণ) শীর্ষক একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর আল-রিসালাহ্ গ্রন্থেও বিভিন্ন মন্তব্যের মাধ্যমে ইসতিহ্সান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দিয়েছেন। তাঁর সেসব বক্তব্যের সারনির্যাস এরূপ-[২৯]

* যে ব্যক্তি ইসতিহ্সান করল সে নতুন শরীয়ত প্রবর্তন করল।[৩০]
* ইসতিহ্সান মূলত প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী আইন প্রবর্তন করে আনন্দ উপভোগ করা।
* মুজতাহিদের জন্য যদি ইসতিহ্সান বৈধ থাকত তবে জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই ইসতিহ্সান থেকে বিধান উদ্ভাবন করতে পারতো।

কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ইমাম শাফিঈও বিভিন্ন মাসআলায় ইসতিহ্সানের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। যেমন-

---

[২৬]. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪২

[২৭]. ড. আ.ক.ম. আব্দুল, কাদের, *ইমাম মালিক ও তাঁর ফিকহচর্চা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২৪৯

[২৮]. ইমাম আল-শাতিবী, *আল-মুয়াফাকাত ফী উসূল আল-শরীআহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০৫

[২৯]. ইমাম মুহাম্মদ ইব্নে ইদরীস আল-শাফিঈ, *আল-রিসালাহ্*, মিসর: শারিকাতু আল-তিবাইহ আল-ফান্নিয়্যাহ আল-মুত্তাহাদাহ্, ১৯৬২, পৃ. ৫০৩

[৩০]. من استحسن فقد شرع অনেক উসূলবিদ আল-রিসালাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর এ প্রসিদ্ধ বাণীটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা উক্ত গ্রন্থের কোথাও এর সন্ধান পাইনি।

* কুরআন স্পর্শ করে শপথ করা প্রসংগে তিনি বলেন, কোনো কোনো অঞ্চলের শাসক কুরআন স্পর্শ করে শপথ করাতেন, আমার মতে এটি ইসতিহসান।[৩১]
* হজ্জের মৌসুমে উমরার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন, উত্তম। আমি ইসতিহসান করেছি যে, আল্লাহর বাণী "যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা একত্রে পালন করতে চায়"[৩২] এর প্রেক্ষিতে এ মৌসুমে এটি হজ্জের পরেই সর্বাধিক প্রিয় কাজ।[৩৩]
* ঈদের দুই দিন পূর্বে সাদকাতুল ফিতর প্রদান বিষয়ে তিনি বলেন, এটি উত্তম। যে এমন করল সে ইসতিহসান করল।[৩৪]

এছাড়া তিনি استحباب (পছন্দ মনে করা) শব্দ ব্যবহার করে ইসতিহসানের প্রয়োগ করেছেন। যেমন-

* যখন কোন মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করে তার জন্য আমি পছন্দ করি যে, তিনি গোসল করবেন ও মাথার চুল মুণ্ডন করবেন।[৩৫]
* উজুকারী ব্যক্তির জন্য আমি পছন্দ করি যে, তিনি উজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবেন। যদি ভুলে যান তবে যখনই স্মরণ হবে তখনই উচ্চারণ করবেন, যদি তা উজু শেষ করার পূর্ব মুহূর্তেও হয়। আর যদি ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ত্যাগ করেন তবে তার উজু ত্রুটিপূর্ণ হবে না।[৩৬]
* আমি পছন্দ করি, যে ব্যক্তি আযান দিবেন তিনিই ইকামত দিবেন।[৩৭]

শাফিঈ মাযহাবের পরবর্তী মুজতাহিদগণও তাদের ইমামের অনুকরণে ইসতিহসানকে শরীয়তের উৎস বিবেচনা করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। তবে ইমাম গাযালী ইমাম কারখী র.-এর পূর্বোল্লিখিত সংগার আলোকে ইসতিহসানকে গ্রহণ করেছেন।[৩৮]

**ঘ. হাম্বলী মাযহাব:** হাম্বলী মাযহাবের অধিকতর শক্তিশালী মত অনুযায়ী ইসতিহসান ইসলামী আইনের উৎস। ইবনে কুদামা, আবু ইয়ালা, আবু খাত্তাব, ইবনে তাইমিয়া

---

৩১. মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আল-শাফিঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭৮ وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن
৩২. আল-কুরআন, ২:১৯৬ (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ)
৩৩. ইমাম আল-শাফিঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৬৮ حسنة استحسنها وهي احب منها بعد الحج
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩ هذا حسن واستحسنه لمن فعل
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪ وإذا أسلم المشرك احببت له ان يغتسل ويحلق شعره : فإن لم يفعل ولم يكن جنبا اجزاه ان يتوضا ويصلي
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭ (واحب للرجل ان يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل ان يكمل الوضوء وإن ترك التسمية ناسيا او عامدا لم يفسد وضوؤه إن شاء الله تعالى)
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬ (وإذا اذن الرجل احببت ان يتولى الإقامة)
৩৮. আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা ফী ইলম আল-উসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৩

প্রমুখ এ মত ব্যক্ত করেছেন।[৩৯] 'রওদাতুন নাযির' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, কাযী ইয়াকুব র. বলেন, ইমাম আহমদের মাযহাব অনুযায়ী ইসতিহ্সান হলো কোন বিধানকে অন্য একটি অধিকতর অগ্রগণ্য বিধানের জন্য ছেড়ে দেয়া। আর কেউ এটি অস্বীকার করেনি, যদিও এর নামকরণে মতভেদ রয়েছে। অর্থগতভাবে একমত হয়ে পরিভাষা নিয়ে মতভেদ করার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই।[৪০]

হাম্বালী মাযহাবে ইসতিহ্সানের দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে, প্রতি নামাযের জন্য নতুন নতুন তায়াম্মুম করা। অথচ কিয়াসের দাবি অনুযায়ী তায়াম্মুম পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের স্থলাভিষিক্ত যা অপবিত্র হওয়া অথবা পানি পাওয়া পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।[৪১]

**ঙ. জাহিরী, মুতাযিলা ও শিআ মাযহাবঃ** জাহিরী মাযহাব কিয়াস প্রত্যাখ্যান এবং কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য (জাহিরী) দলীল গ্রহণের কারণে জাহিরী হিসেবে প্রসিদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ইসতিহ্সানকেও প্রত্যাখ্যান করে। দাউদ আয-যাহিরী বলেন, "কিয়াসের মাধ্যমে বিধান প্রদান আবশ্যক নয় আর ইসতিহ্সানের ভিত্তিতে মতামত প্রদান বৈধ নয়।"[৪২] এ মাযহাবের অন্যতম ইমাম ইব্নে হাযমের মতে, দীনের ক্ষেত্রে ইসতিহ্সানের প্রয়োজনীয়তা শুধু তখনই হতে পারে যদি এ দীন অপূর্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় ইসলাম পূর্ণতা পেয়েছে। সুতরাং ইসতিহ্সান প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়।[৪৩]

মুতাযিলা ও শিআ সম্প্রদায়ও জাহিরীদের মতো ইসতিহ্সানকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[৪৪] তারা মূলত সামগ্রিকভাবে রায় ও কিয়াস বিরোধী হওয়ায় ইসতিহ্সানকেও স্বীকার করেন না।

---

[৩৯]. তাকী উদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মদ (ইব্ন নাজ্জার নামে খ্যাত), *শারহু আল-কাওকাব আল-মুনির*, বিশ্লেষণঃ মুহাম্মদ আল-মুহায়লী ও নাযিয়্যাহ হাম্মাদ, জেদ্দাঃ মাকতাবাতু আল-উবাইকান, ১৪১৮, পৃ. ৪

[৪০]. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইব্নে কুদামাহ আল-মুকাদ্দাসী, *রওদাতু আল-নাযির ওয়া জান্নাতু আল-মানাযির ফী উসূলি আল-ফিকহ আলা মাযহাবি আল-ইমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল*, রিয়াদঃ মুআস্সাসাতু আল-রাইয়্যান লি আল-তিবাআতি ওয়া আল-নাশর ওয়া আল-তাওযীঈ, ১৪২৩, খ. ২, পৃ. ৪৭৩ الاستحسان هو مذهب الإملم أحمد وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاح مع الاتفاق في المعنى

[৪১]. হাসান আহমদ মারঈ, *আল-ইসতিহ্সান ইনদা আল-আইম্মা আল-আরবা' ওয়া তাতবীকাতুহু আল-মুআসিরাহ*, দুবাইঃ *মাজাল্লাতু আল-কুল্লিয়্যাহ আল-দিরাসাহ আল-ইসলামিয়্যাহ আল-আরাবিয়্যাহ*, সংখ্যা ১৯, পৃ. ১৭-১৮

[৪২]. মুহাম্মদ ইব্নে আল-হাসান আল-সাআলাবী, *আল-ফিকর আল-সামী ফী তারিখ আল-ফিকহ আল-ইসলামী*, বৈরুতঃ দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬, খ. ৩, পৃ. ৩১ الحكم بالقياس لا يجب والقول بالاستحسان لا يجوز

[৪৩]. আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে মুহাম্মদ ইব্ন হাযম আন্দালুসী, *আল-ইহ্কাম ফী উসূল আল-আহকাম*, মিসর মাতবাআহ আল-আসিমাহ, তা.বি. খ. ৬, পৃ. ৯৯২

[৪৪]. হাশিম মারুফ *আল-মাবাদী, আল-আম্মাহ লি আল-ফিকহ আল-জা'ফারী*, বৈরূতঃ দার আল-কালাম, ১৯৭৮, পৃ. ২৯৮

### তুলনামূলক ফিকহ ও ইসতিহসানের প্রামাণ্যতা

তুলনামূলক ফিকহ (الفقه المقارن) বলতে মূলত কোন বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মাযহাবী বক্তব্য একত্র করে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহী নীতিমালার আলোকে পর্যালোচনান্তে কোন একটি বক্তব্যকে প্রাধান্য প্রদান। তুলনামূলক ফিকহের মানদণ্ডে ইসতিহসানের প্রামাণ্যতা বিষয়ে আলোচনা করলে আমাদের সামনে দুটি মত প্রকাশিত হয়–

১. ইসতিহসান ইসলামী আইনের উৎস। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ তথা হানাফী, মালিকী ও হাম্বালীগণের মত।

২. ইসতিহসান ইসলামী আইনের উৎস নয়। শাফিঈ, যাহিরী ও শিআ মাযহাব এ মতের প্রবক্তা।

### মতপার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

ইসতিহসানের বিধান ও প্রামাণ্যতার বিষয়ে উপরোক্ত মতপার্থক্যের মূল কারণ ইসতিহসানের পারিভাষিক অর্থ নিরূপণে মতপার্থক্য। উসূলবিদগণের প্রদত্ত ইসতিহসানের সংগার আলোকে বলা যায়, তাঁরা এর ৫টি ব্যবহারিক অর্থ নির্ণয় করেছেন।

১. ইসতিহসান ইজতিহাদ করা এবং যেসব বিষয়ের পরিমাপ বা পরিমাণ নির্ধারণ মুজতাহিদের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যায়নের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেসব-বিষয়ে সার্বিক দিক বিবেচনান্তে তার কাছে যেটি উত্তম মনে হয় সে সিদ্ধান্ত প্রদান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী: "আর তাদেরকে সম্পদ দাও, সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে; এটি সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।"[৪৫] এ অর্থে ইসতিহসানের প্রামাণ্যতার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কেননা সব মাযহাবই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে।[৪৬]

ইমাম আল-জাস্‌সাস ইজতিহাদের ভিত্তিতে নির্ণেয় পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়ে অধিকতর সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তা সম্পর্কে বলেন, "আমাদের সাথীরা এ জাতীয় ইজতিহাদকে ইসতিহসান হিসেবে নামকরণ করেন। এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই বা কেউ এর বিপরীত মত উল্লেখ করেননি"।[৪৭]

---

৪৫. আল-কুরআন, ২: ২৩৬ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

৪৬. আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল-জাস্‌সাস, *আল-ফুসূল ফী আল-উসূল*, বিশ্লেষণ: ড. আজীল জাসিম আল-নাশমী, কুয়েত: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪০৫, খ. ২, পৃ. ২৩৩; আল-সারখসী, *উসূল আল-সারাখসী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০০

৪৭. আল-জাস্‌সাস, *আল-ফুসূল ফী আল-উসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৪; "يسمي أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحسانا، وليس في هذا المعنى خلاف بين الفقهاء، ولا يمكن أحدا منهم القول بخلافه"

২. ইসতিহ্সান অর্থ অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা। যেমন আল্লাহ্র বাণী: "যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।"[৪৮] এ অর্থের ব্যাপারেও ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ নেই; বরং এর প্রামাণ্যতা বিষয়ে তারা একমত। ইবনে তালমাসানী বলেন, "মতবিরোধপূর্ণ ইসতিহ্সানের মধ্যে 'অপরিহার্য দায়িত্বপালন ও উত্তম পন্থা গ্রহণ' অন্তর্ভুক্ত নয়, এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[৪৯]

৩. যদি ইসতিহ্সানের অর্থ হয় কোনো প্রকার শরঈ দলীলের সাথে যোগসূত্র স্থাপন ছাড়াই মুজতাহিদ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কোন বিধানকে উত্তম মনে করা, তবে এ ব্যাপারেও ফকীহ্গণের মতভেদ নেই। কেননা তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেন যে, শরীয়তে এর কোন প্রামাণ্যতা নেই; বরং এটি পরিত্যাজ্য। কারণ এটি প্রবৃত্তির অনুসরণের নামান্তর। ইব্নে তালমাসানী বলেন, "মতবিরোধপূর্ণ ইসতিহ্সানের মধ্যে শরঈ দলীল ব্যতীত নিজের মনের কাছে ভাল লাগা বিষয় অর্ন্তভুক্ত নয়। কেননা ইজমার ভিত্তিতে এটি পরিত্যাজ্য।"[৫০]

এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ হানাফী মাযহাবের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, তারা কোন প্রকার দলীল ছাড়াই শুধু নিজস্ব চিন্তার আলোকে ইসতিহ্সানের প্রয়োগ করেন। কিন্তু বাস্তবতা এমনই যে, হানাফী মাযহাবের কোনো গ্রন্থে এ পদ্ধতির স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। বরং এর বিপরীতে তাঁরা একে নিষিদ্ধ ও পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন।[৫১]

৪. ইসতিহ্সান অর্থ কোনো বিষয়ে মুজতাহিদ যা ভাল মনে করেন সে অনুযায়ী শরঈ ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করা। যেমন জগৎ পরিবর্তনশীল, রসূল প্রেরণ, তাঁদের নবুওয়ত সাব্যস্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মুজতাহিদ কুরআন, সুন্নাহ ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীল উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসতিহ্সান করা। এ ব্যাপারেও ফকীহ্গণের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। সানজী বলেন, আলিমগণ যে ইসতিহ্সান শব্দটি ব্যবহার করেন তা দুই ধরনের। প্রথমত : ইজমার ভিত্তিতে যার আবশ্যকতা

---

৪৮. আল-কুরআন, ৩৯:১৮ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

৪৯. শরফুদ্দীন আল-ফাহরী আল-তালমাসানী, *শারহ্ আল-মাআলিম ফী উসূল আল-ফিকহ*, বৈরূত: আলাম আল-কুতুব, ১৯৯৯, খ. ২, পৃ. ৪৭০ ليس المراد بالاستحسان المختلف فيه: فعل الواجبات ، والأولى؛ فإنه متفق عليه"

৫০. প্রাগুক্ত, "وليس المراد بالاستحسان المختلف فيه ما تميل النفس إليه من غير دليل شرعي؛ فإنه مردود بالإجماع"

৫১. আলাউদ্দীন আব্দুল আযীয ইবনে আহমদ, *কাশফ আল-আসরার আন উসূল ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদাভী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬

প্রমাণিত। আর তা হলো, কোন বিষয় উত্তমভাবে উপস্থাপনের জন্য শরঈ অথবা বুদ্ধিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করা। যেমন জগৎ পরিবর্তনশীল, রসূল প্রেরণ ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ইসতিহসান ওয়াজিব, কেননা সেটিই উত্তম যাকে শরীয়ত উত্তম বিবেচনা করেছে। আর সেটিই খারাপ শরীয়ত যাকে খারাপ বিবেচনা করেছে। **দ্বিতীয়ত :** ইসতিহসান যদি শরীয়তের দলীলের বিপরীত হয়, যেমন কোন বিষয় শরঈ দলীলের ভিত্তিতে পরিত্যক্ত কিন্তু উরফের ভিত্তিতে বৈধ আবার শরীয়তের দলীল কোনো ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেছে কিন্তু উরফ সে ব্যাপারে শিথিলতা অবলম্বন করে। আমাদের দৃষ্টিতে এ জাতীয় বিষয়ের বৈধতার পক্ষে মতামত প্রদান হারাম এবং এ ক্ষেত্রে উরফ ও রায়কে পরিত্যাগ ও মূল দলীলের অনুসরণ ওয়াজিব।[৫২]

৫. ইসতিহসান অর্থ দু'টি দলীলের শক্তিশালী দলীলটি গ্রহণ। এটি তিনভাগে বিভক্ত :

**প্রথমত :** কিয়াসের চেয়ে শক্তিশালী দলীল প্রাপ্তির ভিত্তিতে কিয়াস পরিত্যাগ করার মাধ্যমে ইসতিহসান করা অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও আছার ইত্যাদির ভিত্তিতে কিয়াস পরিত্যাগ করা। এ অর্থেও ইসতিহসানের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কেননা প্রত্যেক ইমাম এ ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন। ইবনে কুদামা র. কাযী ইয়াকুব এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, "কেউ এটি অস্বীকার করেনি, যদিও এর নামকরণে মতভেদ রয়েছে। অর্থগতভাবে একমত হয়ে পরিভাষা নিয়ে মতভেদ করার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই।"[৫৩] ইবনে হাজিব বলেন, "ইসতিহসান মূলত কোনো সাধারণ কিয়াস থেকে শক্তিশালী কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন। আর এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।"[৫৪]

**দ্বিতীয়ত :** উরফ, মাসলাহা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে দলীল পরিত্যাগের মাধ্যমে ইসতিহসান করা। এ প্রকার ইসতিহসানের উদাহরণ : কোনো ব্যক্তি শপথ করল, সে

---

৫২. বদর উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-যারকাশী, *আল-বাহার আল-মুহীত ফী উসূল আল-ফিকহ*, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মুহাম্মদ তামির, বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪২১, খ. ৪, পৃ. ৩৮৯
وقال السنجي: الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم، وهي على ضربين: أحدهما: واجب بالإجماع، وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي على حسنه، كالقول بحدوث العالم .......... ومثل مسائل الفقه، لهذا الضرب يجب تحسينه، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه. والثاني: أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الناس إباحته، ويكون في الشرع دليل يغلظه، وفي عادات الناس التخفيف، فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي.

৫৩. ইব্‌নে কুদামা, *রওদাতু আল-নাযির ওয়া জান্নাতু আল-মানাযির ফী উসূলি আল-ফিকহ আলা মাযহাবি আল-ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭৩ ( وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاح مع الاتفاق في المعنى)

৫৪. জামালুদ্দীন আবু আমর ইব্‌নে হাজিব, *মুখতাসার আল-মুনতাহা বিশরহ আল-আদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮১ "هو [أي: الاستحسان] العدول عن قياس إلى قياس أقوى، ولا نزاع فيه"

অমুক ব্যক্তির সাথে কোনো ঘরে প্রবেশ করবে না। পরক্ষণে সে তার সাথে মসজিদে প্রবেশ করল। কিয়াসের দাবি অনুযায়ী সে তার শপথ ভঙ্গ করল। কেননা মসজিদও এক প্রকার ঘর। যেমন আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ্ সেসব ঘরকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন।"[৫৫] কিন্তু সামাজিক প্রথা হিসেবে ঘর বলা হয় যেখানে মানুষ বসবাস করে। আর মসজিদ বসবাসের স্থান নয়। অতএব যদি উক্ত শপথকারী মসজিদে প্রবেশ করে, তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না।[৫৬]

এ অর্থে ইসতিহসানকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ফকীহগণ সামান্য মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ উসূলবিদ মত প্রকাশ করেছেন, যদি উরফ বা প্রথা দ্বারা মহানবী স.-এর সময়কালের প্রচলন বুঝায় তবে তা সুন্নাহ হিসেবে এবং যদি সাহাবীগণের সমকালীন বিষয় হয় তবে তা ইজমা হিসেবে গ্রহণ করে এর ভিত্তিতে ইসতিহসান করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।[৫৭]

**তৃতীয়ত :** কিয়াসে জলি বা প্রকাশ্য কিয়াসের উপর শক্তিশালী ও অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ অপ্রকাশ্য কিয়াসকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে ইসতিহসান। এ অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ হলো, উভয় প্রকার কিয়াসের মধ্যে সমকালীন প্রেক্ষাপটে মুজতাহিদ কিয়াসে খফীর ইল্লাত বা কারণকে অধিকতর উপযোগী মনে করেন। এ প্রকার ইসতিহসানের ব্যাপারেই মূলত হানাফী ও শাফিঈগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফিঈ র. যে যুক্তির আলোকে ইসতিহসানকে পরিত্যাগ করেন তা হলো, কোনো বিধানের ইল্লাত তাখসীস (নির্দিষ্টকরণ) করার মাধ্যমে ইসতিহসান করলে অনেক সময় মূল বিধান পরিবর্তন হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে ইল্লাতের পেছনের যৌক্তিকতা ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় না কিন্তু বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসতিহসান ইল্লাত নির্দিষ্টকরণের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা ইল্লাত নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে নির্ণিত বিধান অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়। কিন্তু ইসতিহসানের বিষয় তেমন নয়। আবুল ওয়াফা ইবনে আকীল বলেন, "ইসতিহসান ইল্লাত নির্দিষ্টকরণ থেকে ব্যাপক। কেননা ইল্লাত তাখসীস করা মূলত ব্যাপক বিষয়কে নির্দিষ্টকরণের মতই।"[৫৮] ইমাম আবু হানীফা র. হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্ট নাপাক না হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কেননা তার

---

[৫৫]. আল-কুরআন, ২৪:৩৬ فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ ان تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

[৫৬]. ইবনে হাজিব, *মুখতাসার আল-মুনতাহা বিশরহ আল-আদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮২

[৫৭]. আল-আমাদী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৮; আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা ফী ইলম আল-উসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৩; ইবনে হাজিব, *মুখতাসার আল-মুনতাহা বিশরহ আল-আদাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৮

[৫৮]. আবুল ওয়াফা ইব্‌ন আকীল আল-হাম্বলী, *আল-ওয়াদিহ ফী উসূল আল-ফিকহ*, বৈরূত: মুআস্‌সাসাহ আল-রিসালাহ, ১৪২০, খ. ২, পৃ. ১০৭ الاستحسان أعم من تخصيص العلة، لأن تخصيص العلة كتخصيص العموم

লালা পানিতে পতিত হয় না। ইমাম আস-সারাখসী র.-এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, কিয়াসের দাবি মোতাবেক এটি নাপাক। কেননা হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ হারাম হওয়ার কারণে এর উচ্ছিষ্টও অপবিত্র। কিন্তু ইসতিহসানের দৃষ্টিতে তা অপবিত্র না হওয়ার কারণ, হিংস্র প্রাণী দ্বারা উপকার গ্রহণ নিষিদ্ধ নয়। আমরা জানি, সত্তাগতভাবে ঐ প্রাণী নাপাক নয় বরং খাওয়া হারাম হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অপবিত্র বিবেচ্য। কেননা ওগুলো জিহবা দ্বারা পান করে বিধায় লালায় আর্দ্র থাকে, আর লালা মূলত গোশত থেকে বের হয়। কিন্তু পাখির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। কেননা পাখি ঠোঁট দ্বারা পান করে।[৫৯] অতএব বলা যায়, ইসতিহসান ইল্লাত নির্দিষ্টকরণের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা হানাফীগণের দৃষ্টিতে কিয়াসের মাধ্যমে কৃত ইসতিহসানের উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয়, ইসতিহসানের বিধানের ক্ষেত্রে ইল্লাতের ভূমিকা অনুপস্থিত। আর এ কারণেই কিয়াসের ভিত্তিতে ইসতিহসানের প্রামাণ্যতা বিদ্যমান।

উপরোক্ত তুলনামূলক ফিকহী বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসতিহসানকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে সামান্য যে মতভেদ প্রকাশিত হয় তা মৌলিক কোনো মতপার্থক্য নয়। বরং কারো কারো প্রদত্ত ইসতিহসানের সংগা ও কিয়াসের ক্ষেত্রে এর ব্যাপকতা নিয়ে সামান্য মতভেদ বিদ্যমান। তবে হানাফী মাযহাবের ইমাম কারখী প্রদত্ত ইসতিহসানের সংগাকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করলে এ ধরনের মতভেদ থেকে মুক্ত হয়ে ইসতিহসানকে ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎস হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতৈক্য প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শিআগণ সামগ্রিকভাবে ইসতিহসানকে পরিত্যাগ করলেও বর্তমান সময়ের শিআ আইন বিশেষজ্ঞগণ ইসতিহসানকে আইন প্রণয়নের বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৬০]

### ইসতিহসানের প্রকারভেদ

সামগ্রিকভাবে যারা ইসতিহসানকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করেন তারা একে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

* হানাফীগণের দৃষ্টিতে ইসতিহসান চার প্রকার[৬১]:

১. নস-কুরআন ও সুন্নাহ-এর ভিত্তিতে ইসতিহসান
২. ইজমার ভিত্তিতে ইসতিহসান

---

[৫৯]. আল-সারখসী, *উসূল আল-সারখসী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৪
[৬০]. মুহাম্মদ তাকী হাকীম, *আল-উসূল আল-আম্মাহ লি আল-ফিকহ আল-মুকারিন*, বৈরূতঃ দার আল-আন্দালুস, ১৯৭৯, পৃ. ৩৪৩
[৬১]. যাইন উদ্দীন ইব্নে ইবরাহীম ইবনে নুজাইম, *মিশকাতুল আনওয়ার ফী উসূল আল-মানার*, আল-কাহেরা : মাতবাআহ মুসতাফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৩৬, খ. ৩, পৃ. ২০

৩. জরুরাতের (প্রয়োজন) প্রেক্ষিতে ইসতিহ্সান
৪. কিয়াসে খফীর (অপ্রকাশ্য কিয়াস) ভিত্তিতে ইসতিহ্সান।

* মালিকীগণের নিকট ইসতিহ্সান চার প্রকার[৬২]:

১. উরফের (সামাজিক প্রথা) আলোকে ইসতিহ্সান
২. মাসলাহার (জনকল্যাণ) ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
৩. রাফউল হারাজ (কষ্ট লাঘব)-এর জন্য ইসতিহ্সান। হানাফীগণ একে জরুরাত আখ্যা দিয়েছেন।
৪. ইজমার ভিত্তিতে ইসতিহ্সান।

* হাম্বলী মাযহাবে ইসতিহ্সানের বিশেষ কোনো প্রকার উল্লেখ করা হয়নি বিধায় এ মাযহাবের দৃষ্টিতে উপরোক্ত সকল প্রকার ইসতিহ্সানই অন্তর্ভুক্ত করে।

অতএব আমরা ইসতিহ্সানকে ছয় প্রকারে সীমিত করতে পারি:

১. নসের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
২. ইজমার ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
৩. উরফের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
৪. জরুরাত বা রাফউল হারাজ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
৫. মাসলাহার ভিত্তিতে ইসতিহ্সান
৬. কিয়াসে খফীর মাধ্যমে ইসতিহ্সান

**সমসাময়িক অর্থনৈতিক লেনদেনে ইসতিহ্সানের প্রয়োগ**

উপরোক্ত ছয় প্রকার ইসতিহ্সান সমসাময়িক অর্থনৈতিক লেনদেনে নিম্নোক্তভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে-

**১. নস-এর ভিত্তিতে ইসতিহ্সান**

নস-এর ভিত্তিতে ইসতিহ্সান বলতে নস তথা কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে সাধারণ বিধান পরিবর্তন করে উত্তম বিধান গ্রহণ বুঝায়।[৬৩] আকৃতি ও পরিভাষাগত দিক থেকে এটি ইসতিহ্সান হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি নসেরই অংশ যাকে বিশেষ অবস্থায় সাধারণ নীতিমালার ব্যতিক্রম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন-

**ক. কুরআনের দলীলের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান** : ওসীয়তের বৈধতা। সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে তার সম্পদের মালিকানা রহিত হয়ে ওয়ারিসদের প্রতি অর্পিত হয়ে যায়। সুতরাং উক্ত সম্পদে হস্তক্ষেপ করার

---

[৬২]. আল-শাতিবী, *আল-ইতিসাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৯

[৬৩]. আলাউদ্দীন আব্দুল আযীয ইবনে আহমদ আল-বুখারী, *কাশফ আল-আসরার আন উসূল ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদাভী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০

কোনো অধিকার তার থাকে না। কিন্তু ওসীয়ত এর ব্যতিক্রম। কারণ এর বৈধতা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।[৬৪]

**খ. সুন্নাহর প্রমাণের ভিত্তিতে ইসতিহসান :** বাই সালামের চুক্তির বৈধতা। শরীয়তের নীতিমালা হলো, যে পণ্য অস্তিত্বে নেই বা কল্পিত তার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। আর বাই সালামের চুক্তির সময় পণ্যের কোনো অস্তিত্ব থাকে না বিধায় সাধারণ বিবেচনায় এ চুক্তি অবৈধ মনে হলেও এর বৈধতা একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিধান। ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, মহানবী স. যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনাবাসীরা ১ বা ২ বছর মেয়াদী অগ্রিম ফল বেচাকেনা করতেন। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, "যে ব্যক্তি অগ্রিম বেচাকেনা করে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপ, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে করে।"[৬৫]

### ২. ইজমার ভিত্তিতে ইসতিহসান

ইজমার ভিত্তিতে ইসতিহসান বলতে বুঝায়, কোন বিষয়ে ইজমা সম্পন্ন হওয়ায় এর বিপরীত বা সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য কিয়াস পরিত্যাগ করা।[৬৬] যেমন ইসতিসনা চুক্তির বৈধতা। ইসতিসনা বলা হয়, কেউ কোন কারিগরকে (ব্যক্তি/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান) বলল, আমাকে এই এই বৈশিষ্ট্যের অমুক জিনিস তৈরি করে দাও এবং উভয়ে এর বিনিময় নির্ধারণ করলো।[৬৭] চুক্তির সময় যেহেতু পণ্য বা চুক্তিকৃত বস্তু অস্তিত্বহীন থাকে সেহেতু সাধারণ বিবেচনা অনুযায়ী এ ধরনের চুক্তি অবৈধ হলেও ইসতিহসানের মানদণ্ডে ইজমার ভিত্তিতে এটি বৈধ। কেননা এ বিষয়ে সকলে একমত হয়েছেন এবং কেউ তা অস্বীকার করেনি।[৬৮]

### ৩. উরফের ভিত্তিতে ইসতিহসান

উরফের প্রেক্ষিতে ইসতিহসান বলতে কিয়াসের বিপরীতে উরফের বিধান অনুযায়ী কাজ করা বুঝায়।[৬৯] যেমন, গোসলখানা ভাড়া করা। পানি ব্যবহারের পরিমাণ, অবস্থানের সময়কাল নির্ধারণ ছাড়াই শুধু নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে গোসলখানা ভাড়া করা কিয়াসের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা ভাড়াচুক্তিতে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা

---

৬৪. আল-কুরআন, ৪:১২

৬৫. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আস-সালাম, অনুচ্ছেদ : আল-সালাম ফী ওযনিন মা'লুম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১২৬ (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم والى أجل معلوم)

৬৬. আলাউদ্দীন আব্দুল আযীয ইব্‌নে আহমদ আল-বুখারী, *কাশফ আল-আসরার আন উসূল ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদাভী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১

৬৭. ইব্‌নে নুজাইম, *আল-বাহর আল-রাঈক শরহ কানয আল-দাকাঈক*, বৈরূতঃ দারু ইয়াহইয়া আল-তুরাস আল-আরাবী, ১৪২২, খ. ৬, পৃ. ২৫১

৬৮. আল-সারখসী, *উসূল আল-সারাখসী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩

৬৯. ড. হাসনাইন মাহমুদ, *মাসাদির আল-তাশরীঈ আল-ইসলামী*, বৈরূতঃ দার আল-কলম, ১৪০৭, পৃ. ১৯৬

অপরিহার্য, যাতে উভয় পক্ষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ এড়াতে পারে। এ জাতীয় অস্পষ্ট চুক্তি সহীহ্ নয় বরং তা বাতিল। কিন্তু সামাজিক প্রথার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ ছাড়াই গোসলখানা ভাড়া ইসতিহ্সানের ভিত্তিতে বৈধ।[৭০]

**৪. জরুরাত বা রাফউল হারাজ এর ভিত্তিতে ইসতিহ্সান**

কখনো কখনো এমন প্রয়োজন এসে উপস্থিত হয় যে, মুজতাহিদ উক্ত প্রয়োজন পূরণ তথা মুসলিম উম্মাহর সম্ভাব্য কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে কিয়াস পরিত্যাগ করে জরুরাতের আলোকে করণীয় বিষয় গ্রহণ করেন।[৭১] যেমন নারীর দুই হাতের তালু ও মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সতরের অর্ন্তভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। সুতরাং এ অংগগুলো ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাদের সাথে বিবাহ্ বৈধ তাদের সামনে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাদের সামনেও শরীরের সেসব অঙ্গ প্রকাশ করা বৈধ। যেমন ডাক্তারকে রোগের স্থান দেখানো। ইমাম আস-সারাখসী বলেন, সাধারণ বিধান অনুযায়ী কর্তব্য হচ্ছে: পর্দায় আবৃত থাকা, তবে বিশেষ কারণে তার কিছু অংশে দৃষ্টি প্রদান অনুমোদিত যা ইসতিহ্সানের ভিত্তিতে নির্ণিত।[৭২]

**৫. মাসলাহার ভিত্তিতে ইসতিহ্সান**

জনস্বার্থের প্রেক্ষিতে কিয়াসের বিধান বা সাধারণ নীতি থেকে বের হয়ে মানুষের জীবনযাত্রা সহজিকরণের জন্য ইসতিহ্সান প্রয়োগ করাকে জনস্বার্থে ইসতিহ্সান বলা হয়। যেমন দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার কারণে নৌকা বা জাহাজ বা পরিবহণের মালিককে জরিমানা করা। খাদ্য নষ্ট হওয়ার দায়ে খাদ্য বহণকারীকে জরিমানা করা। এ জাতীয় জরিমানা জনস্বার্থের প্রেক্ষিতে করা হয়, যদিও এটি কিয়াস বিরোধী। কেননা উক্ত মজুরের সাথে কৃত চুক্তি অনুযায়ী সে এসব কাজে আমানতদার হিসেবে গণ্য। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পদ নষ্ট না করলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু ইসতিহ্সানের প্রেক্ষিতে এ জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।[৭৩]

**৬. কিয়াসের ভিত্তিতে ইসতিহ্সান**

ইসতিহ্সানের এ প্রকার সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ্য কিয়াস যার ইল্লাত স্পষ্ট থাকে এবং অপ্রকাশ্য কিয়াস যার ইল্লাত গোপন থাকে- এই দুই ধরনের কিয়াসের মধ্যে অপ্রকাশ্য কিয়াসকে গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসতিহ্সান করা। হানাফী

---

৭০. ড. ওয়াহাবাহ আল-যুহাইলী, *উসূল আল-ফিকহ আল-ইসলামী*, দামিশক: দার আল-ফিকর, ১৪০৬, খ. ২, পৃ. ৭৪৫

৭১. আলাউদ্দীন আব্দুল আযীয ইব্‌নে আহমদ আল-বুখারী, *কাশফ আল-আসরার আন উসূল ফাখরুল ইসলাম আল-বাযদাভী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১

৭২. আল-সারখসী, *আল-মাবসূত*, মিসর: দার আল-সাআদাহ, ১৩২৬, খ. ১০, পৃ. ১৪৫

৭৩. ইমাম আল-শাতিবী, *আল-ইতিসাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২১

মাযহাবে এ জাতীয় ইসতিহসানের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এর উদাহরণ পাখির উচ্ছিষ্টের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা ইত:পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে কৃষিজাত ভূমি ওয়াকফ করার বিষয়ে দুটি কিয়াস বিদ্যমান। প্রকাশ্য কিয়াস অনুযায়ী ওয়াকফ বিক্রয় সাদৃশ্য। সুতরাং সনদে ওয়াকফকারীর স্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়া ওয়াকফকৃত ভূমিতে চলাচলের অধিকার অন্তর্ভুক্ত হবে না, যেভাবে বিক্রিত জমিতে হয় না। কিন্তু অপ্রকাশ্য কিয়াস অনুযায়ী ওয়াকফ ভাড়া সদৃশ। সুতরাং সনদে ওয়াকফকারীর স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলেও উক্ত ভূমিতে সাধারণের চলাচলের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। কেননা ওয়াকফের মূল উদ্দেশ্যই হয় কল্যাণ সাধন ও উক্ত ভূমি থেকে উপকার গ্রহণ করা। এ জন্যই মুজতাহিদগণ ইসতিহসান বিবেচনায় দ্বিতীয় প্রকার কিয়াসকে প্রথম প্রকার কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।[৭৪]

**উপসংহার**

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ গতিশীল জীবনব্যবস্থা। মানব জীবনের গতিধারার সাথে সম্পৃক্ত নতুন নতুন বিষয়ে ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি এ ব্যবস্থায় বিদ্যমান। মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় মহান আল্লাহ্ কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে উদ্ভূত পরিস্থিতির বিধান জানিয়ে দিতেন অথবা তিনি নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে তার সমাধান করতেন। রিসালাতের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ফকীহগণ ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস নির্ণয় করেন। ইসতিহসান সেসব উৎসের অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণিত তথ্য-উপাত্তের মূল্যায়ন করে আমরা নিম্নোক্ত ফলাফল অর্জন করতে পারি-

১. ইসতিহসান ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসসমূহের অন্যতম।
২. পরিবেশ পরিস্থিতি ও বাস্তবতার আলোকে মুজতাহিদ কর্তৃক বিভিন্ন বিধান থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত বিধান নির্ধারণ করার পদ্ধতিকে ইসতিহসান বলা হয়।
৩. হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীগণ সামগ্রিকভাবে ইসতিহসানের প্রামাণিকতা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।
৪. ইমাম শাফিঈ র. সামগ্রিকভাবে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে ইসতিহসানকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেও তিনি বিভিন্ন স্থানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি এর সীমিত ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন।
৫. ইমাম কারখী র. প্রদত্ত ইসতিহসানের সংগাকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করলে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইসতিহসান ইসলামী আইনের উৎস বিবেচ্য হতে পারে।
৬. শিআ মাযহাবেও বর্তমানে ইসতিহসানের স্বীকৃতি বিদ্যমান।
৭. ইসতিহসানের বিভিন্ন প্রকারকে আমরা ৬ ভাগে সীমিত করতে পারি এবং প্রত্যেক প্রকারকেই সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে এর বিধান উদ্ভাবন করা সম্ভব।

---

[৭৪]. ড. ওয়াহাবাহ আল-যুহাইলী, *উসূল আল-ফিকহ আল-ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৫

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩০
এপ্রিল-জুন : ২০১২

# ইসলামী জীবন দর্শনে বিচার পদ্ধতি

এ.এইচ.এম শওকত আলী*

*[সারসংক্ষেপ : মহান আলাহ মানুষকে সবার উপরে মর্যাদা দান করেছেন। মর্যাদাসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে যেয়ে কখনো স্বেচ্ছায় আবার কখনো অজ্ঞাতসারে একে অপরের অধিকারে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করে। ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মাঝে যেখানে অবিরাম শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকার কথা, সেখানে অশান্তি ও হানাহানি অনিবার্য হয়ে উঠে। এ অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা যখন আপস-মীমাংসার মাধ্যমে সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন মানুষ আদালতের দ্বারস্থ হয়। আর আদালতের কাছে মানুষের একান্ত প্রত্যাশা ন্যায়বিচারের। একমাত্র ইসলামী জীবনব্যবস্থা ছাড়া পৃথিবীর কোনো জীবন দর্শনেই ন্যায়বিচার পাওয়ার পূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। কাজেই ইসলামী জীবনদর্শনে অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য যা যা প্রয়োজন, আসামীকে গ্রেফতার করার নিয়ম, আসামীকে কোর্টে চালান দেয়ার নিয়ম, মামলা পরিচালনায় যাদের উপস্থিতি আবশ্যক, বিচারকার্যে সাক্ষ্য-প্রমাণের গুরুত্ব, ফেরারী আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ও তার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা, বিচারকের রায় বাতিল কিংবা রিভিউ, বিচার কার্যে জবাবদিহিতা, সর্বোপরি রসূলুল্লাহ স. প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে গৃহীত বিচার কার্যক্রমের বিভিন্ন পদ্ধতি আমাদের জানা প্রয়োজন। অত্র প্রবন্ধে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।]*

## ইসলামী জীবনদর্শনে অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা

মানবমন সাধারণভাবে অপরাধপ্রবণ। এই অপরাধপ্রবণ মনকে অপরাধমুক্ত করে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ন্যায়বিচার। কাজেই অপরাধ প্রতিরোধের কৌশল আত্মস্থ ও কার্যকর করার ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকার (Commitment) থাকতে হবে। অপরাধ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিম্নে আলোচনা করা হলো।
ইসলামী শরীয়তে শাস্তি তিন প্রকার যথা–

**প্রথমত : বিভিন্ন ধরনের কাফ্ফারা :** এমন শাস্তি যা আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।
**দ্বিতীয়ত : হদ্দ ও কিসাস (বিধিবদ্ধ শাস্তি) :** ঐ সমস্ত শাস্তি যা আল্লাহ্র কিতাব বা রসূল স. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং এগুলো কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে বিচারক বা সরকারের নিজস্ব মতামতের কোনো সুযোগ নেই। এ অপরাধ

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা।

সংঘটিতকালে একদিকে যেমন সৃষ্টি জীবের প্রতি অন্যায় করা হয়, তেমনি অন্যদিকে স্রষ্টার নাফরমানী করা হয়। ফলে অপরাধী আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দা উভয়ের নিকট দোষী বলে বিবেচিত হয়। যে অপরাধে আল্লাহ্‌র হকের প্রাবাল্য ধরা হয়েছে, তার শাস্তিকে 'হদ্দ' আর যে অপরাধে বান্দার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, তার শাস্তিকে 'কিসাস' বলে। হদ্দ ও কিসাসের মধ্যে আরো একটি পার্থক্য এই যে, হদ্দকে আল্লাহ্‌র হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয় বিধায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও হদ্দ অব্যবহার্য হবে না। যেমন - যার সম্পদ চুরি হয়ে যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরকে নির্ধারিত শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু 'কিসাস' এর বিপরীত। কিসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণ হওয়ার পর হত্যাকারীর বিষয়টি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর ইখ্‌তিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে বিচার বিভাগের মাধ্যমে কিসাস হিসেবে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে পারে কিংবা দিয়াত-রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে কিংবা ক্ষমা করে দিতে পারে।

**তৃতীয়ত : তাযীর :** ইসলামী শরীয়ত সেসব অপরাধের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি বরং বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে তাকে তাযীর বলে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেমন ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করেন, ততটুকুই দিবেন। এক্ষেত্রে সরকার নিজস্ব আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং বিচারককে তা মেনে চলতে বাধ্য করতে পারে। অবস্থা অনুযায়ী তাযীরকে লঘু থেকে লঘুতর, কাঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। তাযীরের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু হদ্দের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা আমলে নেয়া কোনটাই বিধিসম্মত নয়।[১]
অপরাধ দমনে ইসলামী বিধানের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

**১. প্রতিরোধমূলক ঃ** ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পথ খোলা রেখে মানুষকে অপরাধ করার সুযোগ দেয় না বরং অপরাধের কারণসমূহ যাতে সৃষ্টি না হয়, সে জন্য সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

**২. ইনসাফ ভিত্তিক ঃ** ইসলাম বিচারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে। অপরাধী এবং যে সমাজের বিরুদ্ধে সে অপরাধ করেছে, এ উভয়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে। ইসলাম চোরের হাত কেটে দিতে বলে কিন্তু যদি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, চোর ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করেছিল, সে প্রেক্ষিতে তাকে হাত কাটার মতো শাস্তি দেয়া হয় না। সামান্য জিনিস চুরির অপরাধে ও চোরের হাত কাটা হয় না। অবিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচারের ক্ষেত্রে শাস্তির মাত্রা লাঘব করা হয়।

---

[১]. অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ৪৫৮।

**৩. আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান ঃ** ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো সকলের জন্য ইসলাম একই শাস্তির বিধান দেয়। দেশের কোনো ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নয়।

**৪. সংশোধনমূলক ঃ** আল্লাহ্র হক সম্পর্কিত অপরাধের জন্য ইসলাম অপরাধীকে তাওবা করার সুযোগ দেয়। খালিস নিয়্যতে তাওবা করলে মহান আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন। ফলে সে নিজে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পায়।

**৫. কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ঃ** ইসলাম অপরাধের ক্ষেত্রভেদে বেত্রাঘাত, রজম ও শিরচ্ছেদের বিধান দেয়। এগুলো কঠোর ও কঠিন শাস্তি। এ শাস্তি জনসমক্ষে দিতে হবে, যেন সাধারণভাবে মানুষ শাস্তির কঠোরতা দেখে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এরূপ শাস্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[২]

**ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য যা যা প্রয়োজন**

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যাতে রক্ষিত হয় এবং বিচার যেন বাদী ও বিবাদীর জন্য সহজলভ্য হয় এবং ন্যায়বিচারের সুফল যাতে জনগণ সহজে ভোগ করতে পারে এর জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ঃ

**১.বিচারকের নিকট পৌঁছতে কোন রকমের প্রতিবন্ধকতা না থাকা**

ইসলাম দরিদ্র, অসহায় ও মাযলূম মানুষের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে আদালতের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই ব্যবস্থায় কোনো কোর্ট ফি নেই। এই ব্যাপারে রসূলুলাহ স. বলেন- "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে যদি মুসলমানদের কোনো বিষয়ে দায়িত্বভার অর্পণ করেন, এরপর সে ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত ও অসহায় লোকদের তার নিকট পৌছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের ক্ষেত্রে অন্ত রায় সৃষ্টি করে রাখবেন।"[৩]

**২. বাদী-বিবাদী উভয়ের সাথে একই ধরণের আচরণ করা**

এ ব্যাপারে বিশ্বখ্যাত "ফাতওয়ায়ে শামী" গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

ক. বিচারক মসজিদে বা বাড়িতে কিংবা এমন কোনো স্থানে বসে বিচার করবেন যেখানে প্রবেশ করার ব্যাপারে সকলের অনুমতি রয়েছে।

---

[২] শায়খ আবদুল হায়্যি আল-কাত্তানী, *আত-তারাতীবুল ইদারিয়া*, বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি, খ. ১, পৃ. ৪৫

[৩] মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল খতীব আত-তাবরিযী, *আল- মিশকাতুল মাসবীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ ওয়াল কাদা, অনুচ্ছেদ :মা আলাল উলাতি মিনাত তাইসীর, আল-কাহেরাঃ আল-মাকতাবতুত তাওফীকিয়্যাহ, ২০০৫, খ. ২, পৃ. ৩১০, হাদীস নং- ৩৭২৬

খ. তিনি বাদী-বিবাদী কারো নিকট থেকে হাদিয়া-উপহার গ্রহণ করবেন না। মুআয ইবনে জাবাল রা. বলেন, রসূলুলাহ স. আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ কালে বললেন, আমার অনুমতি ব্যতীত কোনো বস্তু গ্রহণ করবে না। কারণ তা প্রতারণার শামিল। যে ব্যক্তি প্রতারণা করবে কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই প্রতারণার বস্তুসহ উপস্থিত হবে। এজন্য আমি তোমাকে ডেকেছি। এখন তোমার কাজে চলে যাও।[৪]

গ. বিচারক বাদী-বিবাদী কারো দাওয়াতে অংশগ্রহণ করবেন না।

ঘ. বাদী-বিবাদীদেরকে বসানো, তাদের প্রতি মনোযোগ প্রদান, ইশারা কিংবা সংকেতদান অথবা দৃষ্টিদানের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের প্রতি সমতা বজায় রাখতে রসূলুলাহ স. নির্দেশ দিয়েছেন।[৫]

ঙ. কোনো এক পক্ষের সাথে গোপন আলাপ, উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলা, মুখোমুখি হাসা, তাদের সম্মানার্থে দাঁড়ানো এ জাতীয় কোনো আচরণ না করতে রসূলুল্লাহ স. নির্দেশ দিয়েছেন।[৬]

চ. বিচার মঞ্চে বসে ঠাট্টা-মশকরা করবে না।

ছ. সাক্ষী কেমন করে সাক্ষ্য বাক্য উচ্চারণ করবে তা শিখাবে না।

জ. কোনো পক্ষ এমন কথা বলবে না যা অপর পক্ষ বুঝতে অক্ষম।[৭]

**৩. বাদী ও বিবাদীর দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন**

ক. বাদী ব্যক্তি তার দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করবে।

খ. বাদী প্রমাণ পেশ করতে না পারলে বিবাদী শপথ করবে। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ "প্রমাণ পেশ করা বাদীর উপর কর্তব্য। আর অস্বীকারকারী (বিবাদী) এর উপর শপথ করা বাধ্যতামূলক।"[৮]

গ. শরীয়ত বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত বাদী-বিবাদী সর্বাবস্থায় সন্ধি করতে পারে।

ঘ. বিচারক তার বিবেচনা মতে ফয়সালা প্রদানের পর এ ব্যাপারে পুনঃবিবেচনা করার ইখতিয়ার রাখে।

---

[৪] অধ্যাপক এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ৫, পৃ. ৫৯৬

[৫] আলী ইবনু উমর আদদারু কুতনী, *সুনানে দারু কুতনী*, অধ্যায়: আল-কাদা, বৈরূতঃ মুআছছাতুর রিসালা, ২০০৪, খ. ৫, পৃ. ৩৬৬, হাদীস নং- ৪৪৬৬

[৬] প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৪৬৭

[৭] মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবেদীন, *রাদ্দুল মুখতার আলাদ দুররিল মুখতার শরহি তানবীরিল আবসার*, অধ্যায়: আল-কাদা, আর-রিয়াদ: দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ৮, পৃ. ২১

[৮] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: ফির-রাহন, অনুচ্ছেদ: ইজা ইখতালাফার রাহিনু ওয়াল মুরতাহিনু ..., রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৯৮

ঙ. মামলা পেশ করার একটি নির্দিষ্ট দিন থাকা বাঞ্ছনীয়।

চ. ভিনদেশী বা দূরদেশী লোকদের শুনানি আগে হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে মামলার এক পক্ষ দরিদ্র ও এক পক্ষ ধনী হলে আচরণের ক্ষেত্রে গরীবের প্রতি সহায়তার নযর প্রদান করা আবশ্যক।

ছ. মুসলমান মাত্রই সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত। তবে যদি কোনো ব্যক্তি সাজাপ্রাপ্ত হয় কিংবা কখনো মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তবে এ জাতীয় ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারবে না।

**৪. বিচারকের জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া বা খিটখিটে মেজাজের হওয়া অনুচিত** (এ ব্যাপারে রসূল স. বলেন: "ক্রোধাবস্থায় দু'পক্ষের মধ্যে বিচার করা বিচারকের জন্য শোভনীয় নয়।"[৯] ক্ষুদ্ধ অবস্থায় বিচারকার্য সম্পাদন করতে রসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেছেন ঃ যেমন তিনি বলেন: "কোনো বিচারক ক্রোধান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করবে না।)[১০]

**৫. মহিলা ও পুরুষের সাক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রবণ করা বাঞ্ছনীয়।**

**৬. কোনো বিষয় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত রায় ঘোষণা না করা।** (প্রয়োজনে সময় বৃদ্ধি করে নেয়া উত্তম। কোনো মামলার ব্যাপারে রায় দিতে হাকিম অপারগ হলে তা উচ্চ আদালতে স্থানান্তরিত করা উচিত।)

**৭. বিচারের আসনে বসে উপদেষ্টাদের থেকে মতামত গ্রহণ না করা বাঞ্ছনীয়** (মতামত নেয়া আবশ্যক হলে তা ভিন্ন ভাবে নেয়া উচিত।)

**৮. বিচারক রায় শুনানির সময় বলবে, আমি এই আদালতে বিচারক হিসেবে এই রায় ঘোষণা করছি** (রায়ের ভাষা মার্জিত হওয়া উত্তম, যাতে বাদী-বিবাদী ভয়ে আতঙ্কিত না হয়ে পড়ে।)

**৯. বিচারকের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে, সর্বকাজে আল্লাহ্র হুকুম ও রসূলুল্লাহ্ স. এর আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা** (বিচারক যদি বিচার কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে আল্লাহর আইন ও নবী স. এর আদর্শ সামনে রাখেন তাহলেই কেবল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।)

**১০. অনেক সময় সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ভুল থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না** (কাজেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করবে; যেন তিনি বিবাদ-মীমাংসায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে রায় দেয়ার তাওফীক দেন।)[১১]

---

[৯] ইমাম মুসলিম, *সহীহ আল-মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আকদিয়া, অনুচ্ছেদ : কারাহাতু কাযাইল কাযী, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, ২০০৩, খ. ১২, পৃ. ২৪১

[১০] ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৮৮৯, খ. ৬, পৃ. ৪৮০

[১১] অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১

## আসামীকে গ্রেফতার করার নিয়ম

কোনো ব্যক্তি যদি বিচারকের কাছে কোনো লোক সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করে যে, তার নিকট আমার সম্পদ কুক্ষিগত অবস্থায় আছে আর বিচারক যদি স্বাক্ষী প্রমাণ দ্বারা অথবা বিবাদীর স্বীকারোক্তি দ্বারা অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পান, এমতাবস্থায়ও বাদীর আবেদন ব্যতীত বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিতে পারবেন না। যদি বাদী গ্রেফতার করার আবেদন করে, তবুও প্রথমবারেই তাকে গ্রেফতার করা যাবে না। বরং তাকে বাদীর সাথে সুরাহা করার সুযোগ দিয়ে বলা হবে, যাও বাদীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করো। এরপরও যদি তাদের মধ্যে কোনো প্রকার সমঝোতা না হয় এবং বাদী পুনরায় আদালতের শরণাপন্ন হন, তাহলে বিচারক বিবাদীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিতে পারবেন। তবে বাদী যদি বলে, বিবাদী আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, তাহলে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না। কিন্তু বাদী যদি এ দাবি করে, বিবাদী আমার পাওনা পরিশোধ করতে সক্ষম, পক্ষান্তরে বিবাদী যদি বলে আমি অভাবী, তাহলে তার কথা গ্রহণ করা কিংবা না করার ব্যাপারে এখতিয়ার থাকবে।[১২]

## আসামীকে কোর্টে চালান দেয়ার নিয়ম

কেউ যদি বিচারকের কাছে এ মর্মে মামলা দায়ের করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার হক কেড়ে নিয়েছে এবং সে যদি তার বিবাদীকে বিচারকের দরবারে হাযির করার আবেদন করে তাহলে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিবাদীকে হাযির করার ক্ষেত্রে বিচারক নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করবেন-

বিবাদী যদি সুস্থ পুরুষ হয় অথবা এমন সুস্থ মহিলা হয়, যে বাইরে বের হতে অভ্যস্ত, তাহলে তাদেরকে বিচারকের আদালতে উপস্থিত করানোর জন্য লোক প্রেরণ করা হবে।

আর যদি বিবাদী অসুস্থ হয় এবং শহরের বাসিন্দা না হয় কিংবা এমন মহিলা হয় যে পর্দা রক্ষা করে চলে এবং ঘরের বাইরে চলাফেরা করে না, তাহলে এক্ষেত্রে বাদীর আবেদন গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ বিবাদীকে হাজির করা সংক্রান্ত আবেদনটি নাকচ করে দেয়া হবে। তবে যদি বিচারক প্রতিনিধি নিয়োগ করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তাহলে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে এই মামলার নিস্পত্তির জন্য বিবাদীর বাড়ীতে পাঠাবেন। আর যদি বিচারকের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগের অনুমতি না থাকে, তাহলে একজন বিশ্বস্ত ফকীহকে দু'জন ন্যায়বিচারক সাক্ষীসহ প্রেরণ করবেন। তারা ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে জেনে তার কাছে সাক্ষ্য দিবেন।[১৩]

---

[১২] শায়খ নিযাম বুরহানপুরী, *আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ/আল-আলমগিরিয়া,* অধ্যায়: আদাবুল কাযী, অনুচ্ছেদ: ফিল হাবসি ওয়াল মুলাযামাতি, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

বিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করার জন্য লোক প্রেরণের পর যদি না পাওয়া যায় এবং বাদী যদি দাবি করে যে, সে নিজ বাড়ীতেই আত্মগোপন করে আছে এবং যদি আরো আবেদন করে যে, বিবাদীর বাড়ীটিকে সীল করা হোক, এমতাবস্থায় বিচারক সাক্ষী-সাবুদের ভিত্তিতে যদি প্রমাণ পান যে, সে নিজ বাড়ীতেই অবস্থান করছে, তাহলে বিচারক বিবাদীর বাড়ীর সদর দরজাটি সীল করে দিবেন। বাড়ী থেকে বের হওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে তাকে কার্যত গৃহবন্দী করে রাখা হবে, যেন সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

যদি কয়েক দিন গৃহবন্দী থাকার পরও সে আত্মসমর্পণ না করে এবং বাদীর পক্ষ থেকে এ দাবি করা হয় যে, সে যেহেতু হাযির হচ্ছে না কাজেই তার পক্ষ থেকে একজন উকিল নিযুক্ত করে দিন। আমি তার সামনে আমার দাবির স্বপক্ষে সাক্ষী পেশ করবো। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ র. এর মত হলো, বিচারক দু'জন সাক্ষীসহ বিবাদীর বাড়ীতে একজন দূত পাঠাবেন। এই দূত একাধারে তিন দিন বিবাদীর বাড়ীর গেটে প্রচারকার্য চালাবে। প্রতিদিন তিনবার সে এ ঘোষণা দিবে, হে অমুকের পুত্র অমুক, বিচারক তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমার প্রতিপক্ষ অমুকের পুত্র অমুকের মোকাবিলায় বের হতে এবং বিচারকের আদালতে হাযিরা দিতে। অন্যথায় তোমার পক্ষ থেকে একজনকে উকিল নিযুক্ত করে দাও। তার উপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন করা হবে। এর পরও যদি বিবাদী হাযির না হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত করে বাদী পক্ষের সাক্ষীর শুনানি শেষে বিচারক বিবাদীর বিপক্ষে হুকুম জারি করবেন।[১৪]

আসামীকে হাযির করার আরেকটি পদ্ধতি হলো, বিচারক তার দু'জন প্রতিনিধির নেতৃত্বে কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী এবং কয়েকজন মহিলার একটি বিশেষ দল আসামীর বাড়ীতে প্রেরণ করবেন। অবশ্য এর আগে বিচারককে বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে জানতে হবে যে, বিবাদী তার নিজ বাড়ীতেই আত্মগোপন করে আছে। উক্ত বিশেষ দলের সদস্যগণ বিবাদীর বাড়ীতে পৌছার পর নিরাপত্তা কর্মীরা বাড়ীর সামনে এবং পিছনে সকল পথে অবস্থান গ্রহণ করবে, যেন সে পলায়ন করতে না পারে। অত:পর মহিলা সদস্যরা কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে বাড়ীর মহিলাদেরকে বলবে, তোমরা নিরাপদ স্থানে চলে যাও। এরপর বিচারকের প্রেরিত নিরাপত্তাকর্মীরা বাড়ীতে প্রবেশ করে তল্লাশী চালাবে। যদি এই তল্লাশীতে বিবাদী ধরা পড়ে তাহলে বের করে আনবে, অন্যথায় মহিলা সদস্যদের দ্বারা তল্লাশী অভিযান চালানো হবে। কারণ অনেক সময় আসামীরা মহিলাদের ভীড়ের মাঝে আত্মগোপন করে থাকে।[১৫]

---

[১৪] প্রাগুক্ত

[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

বিচারক বিবাদীকে হাযির করার উদ্দেশ্যে বাদীর নিকট যদি সীল-মোহর যুক্ত কোনো কাগজ বা অন্য কিছু আলামত প্রেরণ করে তাহলে তা বৈধ হবে। এক্ষেত্রে বাদী গিয়ে বিবাদীকে বিচারকের সীলযুক্ত কাগজ দেখিয়ে বলবে, এই দেখ অমুক বিচারকের কাগজ, তিনি তোমাকে তার আদালতে হাযির হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী হাযির হও। তখন সে যদি হাযির না হয়, তাহলে বাদী তার এই অবাধ্যতামূলক আচরণের জন্য দু'জন সাক্ষী নির্ধারণ করবে, যারা বিচারকের কাছে তার ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। এই সাক্ষীদের বিবরণ শুনে বিচারক এমন আইনী ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বিবাদীর কাছে প্রেরণ করবেন যে তাকে বিচারকের কাছে হাযির করে দিবে কিংবা বিচারক এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসকের সাহায্য গ্রহণ করবেন।[১৬]

### মামলা পরিচালনায় যাদের উপস্থিতি আবশ্যক

মামলা পরিচালনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের ব্যাপারে যাদের উপস্থিতি আবশ্যক তারা হচ্ছেন নিম্নরূপ-

১. বেচা-কেনার মামলার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি যদি বিক্রিত সম্পদের ব্যাপারে নিজেকে উক্ত মালের মালিক দাবি করে এবং তা ক্রেতার নিকট থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে চায় বা নিয়ে যায়, তাহলে উক্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিত থাকা শর্ত।
২. ভাড়া সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপস্থিত থাকা শর্ত।
৩. বন্ধকী সম্পদ সংক্রান্ত মামলায় বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপস্থিত থাকা শর্ত।
৪. হক্কে শুফ্আ সংক্রান্ত মামলায় ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিত থাকা জরুরী।[১৭]

### বিচারকার্যে সাক্ষ্য-প্রমাণের গুরুত্ব

সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার জন্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা একান্ত আবশ্যক। অভিযোগ সম্বন্ধে সত্যের উদঘাটন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের বিধান রাখা হয়েছে। এক ইয়াহূদী আলী রা. এর লৌহবর্ম চুরি করেছিল। তিনি তার নিকট তা ফেরত চাইলেন কিন্তু সে তা ফিরিয়ে দিতে রাযী হল না। তখন তিনি একজন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় আদালতে হাযির হয়ে বিচারপ্রার্থী হলেন। বিচারক খলীফার শুধু দাবির উপর ভিত্তি করে রায় না দিয়ে সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য বললেন। তিনি পুত্র হাসান এবং স্বীয় ক্রীতদাসকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করলেন । আলী রা. এর দাবি আর হাসান ইবনে আলী রা. এর সাক্ষ্য

---

[১৬] প্রাগুক্ত
[১৭] মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসায়িল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯, খ. ৫, পৃ.

প্রদান সত্ত্বেও এতে যেহেতু ইসলামের নিরপেক্ষ বিচারনীতি অনুসারে পিতার অনুকূলে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, তাই বিচারক ইয়াহূদীর পক্ষে রায় প্রদান করেন। নিরপেক্ষ বিচারের এমন দৃষ্টান্ত দেখে ইয়াহূদী মুগ্ধ হয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হলেন এবং বর্মটি খলিফা আলী রা. এর- এ কথা স্বীকার করে সে তাকে তা ফেরত দিলেন।[১৮]

সাক্ষ্যের উপরই যেহেতু নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার অনেকাংশে নির্ভরশীল এ কারণে শরীয়তে সাক্ষ্য-প্রমাণের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার অনুসরণ একান্ত আবশ্যক।

১. সাক্ষীর জন্য ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। কেননা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতিরেকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ ব্যাপার। কুরআন মজীদে উলেখ আছে, "এবং তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে।"[১৯]

সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। স্নেহ-ভালবাসা এবং ভয়-ভীতি অনেক সময় মানুষকে প্রভাবিত করে। তাই পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং মনিব ও গোলামের সাক্ষ্য পরস্পরের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২. কোনো সাক্ষীর ব্যাপারে যদি জানা যায় যে, সে মিথ্যাবাদী, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। মিথ্যাবাদী সাক্ষীর শাস্তির প্রকৃতি ও সময়সীমা রাষ্ট্রের এখ্তিয়ারে থাকবে। স্থান-কাল ও পাত্রভেদে তা নিরূপণ করা হবে। উমর রা. এর খিলাফতকালে মিথ্যা সাক্ষীর মুখে কালিমা লেপন করা হতো এবং তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হতো। আল্লামা জামাল উদ্দীন যায়লায়ী র. 'নাসবুর রায়া লি আহাদিসিল হিদায়া' গ্রন্থে মুসান্নাফে ইবনে আবূ শায়বা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন- "উমর রা. সিরিয়ার গভর্নরের নিকট এ মর্মে পত্র লিখলেন, যেন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে চল্লিশটি বেত লাগানো হয়, তার চেহারায় কালিমা লেপন করা হয়, তার মাথা ন্যাড়া করে দেয়া হয় এবং তাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হয়।"[২০]

৩. সাক্ষ্য প্রদানে কোনো রূপ গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ না করা এবং সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত না থাকা। কেননা সাক্ষ্য দেয়া ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী।"[২১]

---

[১৮] ড. ওয়াহ্‌বাহ আয-যুহাইলি, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামেস্ক : দারুল ফিকর, ২০০৭, খ.৮, পৃ.৬৪১

[১৯] আল-কুরআন, ৬৫ ঃ ২

[২০] জামাল উদ্দিন যায়লায়ী, *নাসবুর রায়া লি আহাদিসিল হিদায়াহ*, অধ্যায় : আশ শাহাদাহ, জেদ্দাহ : আল মাকতাবাতু আল মাক্কিয়াহ, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৭৪।

[২১] আল-কুরআন, ২ ঃ ২৮৩

৪. সব অপরাধ এক ধরনের নয়। গুরুত্ব বিচারে পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে সাক্ষীদের সংখ্যার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রাখা রয়েছে। ব্যভিচার সংক্রান্ত মামলা-মোকাদ্দমার ক্ষেত্রে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য অপরিহার্য ঘোষণা করা হয়েছে। হত্যা ও অন্যান্য হদ্দের ক্ষেত্রে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য আবশ্যক। আর অন্যান্য অধিকার তা মাল সংক্রান্ত হোক বা বিবাহ-তালাক ইত্যাদি সম্পর্কিত হোক, এসবের ক্ষেত্রে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট।[২২]

কোনো রাষ্ট্রে যদি উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে আদালত গঠন করা হয় এবং ইসলামের বিধানের আলোকে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে যুলুম, অবিচার ও ফিত্না-ফাসাদ তিরোহিত হবে এবং শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হবে।

**ফেরারী আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ও রায় ঘোষণা**

বিচার বিভাগীয় পরিভাষায় কোর্টে অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং যে বাদীর দাবি সম্পর্কে অবগত নয়, তার বিরুদ্ধে বিচারকের রায় দেয়াকে কাযা আলাল-গায়ব বা অনুপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে রায় দেয়া বলা হয়।[২৩]

সাধারণভাবে সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিংবা তার পক্ষে ফয়সালা গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে তার পক্ষে যদি কেউ মামলার লড়াইয়ে অংশ নেয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির উপস্থিতিতে রায় দেয়া জায়েয আছে। যদি কোনো নিহত ব্যক্তির দুই ওয়ারিসের মধ্যে একজন উপস্থিত হয়ে আদালতে এ দাবি করে যে, অপর ওয়ারিস যে অনুপস্থিত, সে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছে, আর আমার অংশের বিনিময়ে হত্যাকারীর উপর মাল ওয়াজিব হয়েছে, এ অবস্থায় যদি হত্যাকারী অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাকে ক্ষমা করার কথা অস্বীকার করে এবং বাদী তার বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ দাড় করায় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর এর উপর নির্ভর করে উপস্থিত-অনুপস্থিত উভয়ের ব্যাপারে রায় দেয়া হবে।[২৪]

**বিচারকের রায় বাতিল কিংবা রিভিউ**

বিচারকের ফয়সালা বা রায় যদি কোনো সঠিক কারণের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে সে কারণটি রহিত হয়ে যায় তাহলে বিচারকের পূর্ববর্তী দেয়া রায় বাতিল হবে না। আর যদি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিচারক পূর্বে যে রায় প্রদান করেছিলেন মূলত সে রায়ের পেছনে কোনো কারণ ছিল না যদিও বাহ্যিকভাবে তা মনে হয়, তাতে ইমাম আবূ হানীফা র. এর মতে বিচারকের রায় বাতিল হয়ে যাবে

---

[২২] ডা. ওয়াহাবা আল-যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৩।
[২৩] শায়খ নিযাম বুরহানপুরী, *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯
[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. এর মতে, এক্ষেত্রে বিচারকের রায় বাতিল হয়ে যাবে।[২৫]

### বিচারকার্যে জবাবদিহিতা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এবং জুলুম অবসানে বিচারকার্যে জবাবদিহিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লামা কাত্তানী উলেখ করেন, মহানবী স. তাঁর বিচারকগণের বিচার কার্যক্রম তদারকি করতেন। তাছাড়া তিনি নিজে যে সমস্ত বিচার-ফয়সালা করতেন যথাসম্ভব সেগুলোরও মাঠ পর্যায়ে খোঁজখবর নিতেন।[২৬]

এছাড়া মহানবী স. দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম-যিনি জনগণের দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন।"[২৭]

মহানবী স. যায়দ ইব্‌নে আরকাম এবং আলা ইব্‌নে উকবাকে সেরেস্তাদার নিয়োগ করেছিলেন। তারা উভয়ে বিভিন্ন গোত্রের ঘটনাবলী, চুক্তিপত্র এবং আনসারদের নারী-পুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়সমূহ লিখে রাখতেন।[২৮]

### রসূলুল্লাহ স. প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে গৃহীত বিচার কার্যক্রমের বিভিন্ন পদ্ধতি

মহানবী স.-কে কেউ কেউ কেবল ধর্মীয় নেতা মনে করেন। অনেকে আবার ইসলামকে আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্ম মনে করতে চান। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং মুহাম্মদ স. যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ তা তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে। এসবের আলোকে মহানবী স. এর বিচার কার্যক্রমের একটি প্রক্রিয়া (চৎড়পবফঁৎব) আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। নিম্নে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা হল-

### ১. অভিযোগ দায়ের বা আরজি পেশ

মহানবী স. এর অধিকাংশ বিচার কার্যক্রমে দেখা যায়, তাঁর কাছে প্রথমে অভিযোগ বা আরজি পেশ করতে হয়েছে। সেই অভিযোগ পেশ বিভিন্ন রকমের ছিল। যেমন -

ক. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করতে পারে। যেমন কেউ তার ভাই বা গোত্রীয় কোনো ব্যক্তির হত্যার অভিযোগ করেছে, চুরির অভিযোগ তুলেছে, জমিজমা ইত্যাদির ঝগড়া মীমাংসা করার জন্য আরজি পেশ করেছে।

---

[২৫] প্রাগুক্ত,

[২৬] শায়খ আল-কাত্তানী, *আত-তারাতীবুল ইদারিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৬

[২৭] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ ঃ কাউলিল্লাহি আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরিমিনকুম, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, খ. ১০, পৃ. ৪০৫,হাদীস নং-৬৬৫৩

[২৮] আল-কাত্তানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

খ. অপরাধী নিজেই ঈমানের তাকিদে আবেদন করেছে। যেমন মালিক ইবনে ইয়াহইয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, আসলাম গোত্রের মা'ইয আল-আসলামী রসূলুল্লাহ স. এর নিকট এসে যেনা করার কথা প্রকাশ করলেন এবং চারবার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে আদেশ দিলেন রজম বা পাথর নিক্ষেপ করার জন্য।[২৯]

গ. তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ দায়ের বা বিচারালয়ের আওতাধীন আনা। যেমন আবূ হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস- রসূলুল্লাহ স. মা'ইয আল-আসলামীকে বললেন, আমার নিকট যে কথা পৌছল সেটা সঠিক কিনা? তখন তিনি বললেন, আপনার নিকট কী কথা পৌছেছে? তখন রসূল স. বললেন, তুমি নাকি উমুক গোত্রের একজন দাসীর সাথে যেনা করেছ? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি চারবার সাক্ষী দিলেন। তখন রসূল স. তাকে রজম বা পাথর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন।[৩০]
তবে সাধারণত অভিযোগ দায়ের করার পূর্ব পর্যন্ত মহানবী স. কোনো সিদ্ধান্ত দিতেন না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগ দায়ের হলেই তিনি বিচার করতেন।

আল-মারগীনানী লিখিত আল-হিদায়া গ্রন্থের আশ-শাহাদাহ অধ্যায়ে বলেন, "সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে প্রধান বিচারপতির আদালতে এক নাগরিক তার বিরুদ্ধে আরজি পেশ করে। তিনি স্বশরীরে আদালতে উপস্থিত হন এবং বিচারের রায় তার বিরুদ্ধে যায়। বিচার শেষে তিনি তাঁর তরবারি কোষমুক্ত করে বলেন, কাযী সাহেব! আপনি যদি ন্যায়বিচার না করতেন তবে আমার এই তরবারি আপনাকে দ্বিখন্ডিত করতো। কাযী সাহেব তাঁর চাবুক উঁচিয়ে বললেন, আপনি যদি বিচারের রায় মেনে না নিতেন, তবে এই চাবুক আপনার পিঠকে রক্তে রঞ্জিত করতো।"

**২. সমন জারি**
বিচার কার্যক্রমে দেখা যায়, কেউ এককভাবে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে বিচারক তাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করতেন। লিখিতভাবেও বিবাদীকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করা হতো। যেমন সাহল ইবনে আবি খাছমা রা. থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, ইয়াহূদীরা আবদুল্লাহ ইব্ন সুহায়লকে খায়বারে গুপ্ত হত্যা করলে তার ভাই মুহায়্যাসা ও আবদুর রহমান ইব্নে সুহায়ল নবী করীম স. এর নিকট এসে অভিযোগ দায়ের করেন। রসূলুল্লাহ স. ইয়াহূদীদের মতামত জানার জন্য তাদের বিরুদ্ধে লিখিত সমন জারী করেন।[৩১]

---

[২৯] ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফির-রাজ্ম, দেওবন্দ: আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা. বি. খ. ২, পৃ. ৩৪৮

[৩০] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিততালকীন ফিল-হাদ্দ, আল-কাহেরা: দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৩, পৃ. ৪৫৫।

[৩১] ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-কাসামা, অনুচ্ছেদ : তাবদিয়াতু আহলিদ দাম ফিল কাছামা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪

ইমাম ইব্নুত তুল্লা এই ঘটনার আলোকে বলেন, প্রশাসক হতে দূরে অবস্থানরত ব্যক্তিকে হাজির করা না গেলে তাকে লিখিত নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে।[৩২]

সাবিত ইবনে কায়স রা. এর স্ত্রী জামিলা রসূলুল্লাহ স. এর কাছে এসে অভিযোগ দায়ের করল যে, সাবিত তার একটি হাত ভেঙ্গে ফেলেছে। একথা শুনে মহানবী স. সাবিতকে ডেকে আনলেন এবং ফয়সালা করলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঐ মহিলার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।[৩৩]

মুহাম্মদ ইবনে খালাফ আল-ওয়াকী তাঁর আখবারুল কুদাত গ্রন্থে বলেন, আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদ-এর বিরুদ্ধে এক ইয়াহুদী নাগরিক মামলা দায়ের করলে ইমাম আবূ ইউসুফ র. খলীফাকে আদালতে উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য পেশের জন্য সমন জারি করেন। তিনি স্বশরীরে আদালতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। এ মামলার রায় তাঁর বিপক্ষে যায় এবং তিনি তা নীরবে মেনে নেন।

### ৩. আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান

কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পর মহানবী স. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতেন। আবূ হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী রা. বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, একবার দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স. এর দরবারে মামলা দায়ের করলো। তাদের একজন বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন। দ্বিতীয়জন বলল, হাঁ, আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন এবং তার আগে আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। মহানবী স. বললেন, আচ্ছা বল। সে বলল, আমার ছেলে তার চাকুরী করতো। অত:পর সে তার মালিকের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে। লোকটি আমাকে জানাল, আমার ছেলেকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হবে। অত:পর আমি তাকে ১০০ বকরী এবং আমার ১টি বাদী ফিদইয়া হিসেবে দিলাম। তারপর আমি আলিমদের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, তারা আমাকে জানাল যে, আমার ছেলেকে ১০০ বেত্রাঘাত ও ১বছরের নির্বাসন দন্ড দেয়া হবে। তারা আমাকে আরো অবগত করল যে, তার স্ত্রীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হবে। রসূল স. বললেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিব। তোমার বকরী ও বাদী ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তার ছেলেকে ১০০ বেত্রাঘাত ও ১ বছর নির্বাসন দন্ড প্রদান করেন। অত:পর উনাইস আল-আসলামীকে অন্য একজন মহিলাকে নিয়ে আসার

---

[৩২] ইমাম ইব্নুত্ তুল্লা কুরতুবী, *আকদিয়াতুর রাসূল*, (উর্দু), তাহকীক জিয়াউর রহমান আ'জমী, লাহোর: ইদারা মা'আরিফে ইসলামী, ১৯৮৭, পৃ. ২৬

[৩৩] ইমাম বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা, অধ্যায় : *আল-কাসামা*, অনুচ্ছেদ : আহলুল কাসামা ওয়াল বেদায়া ফিহা মাআল লাওছি, পাকিস্তান : দারুল ফিকির তা. বি, খ. ১২, পৃ. ২০৭

নির্দেশ দিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, সে যদি স্বীকৃতি দেয় তাহলে তাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হবে। তারপর সে স্বীকৃতি দিল এবং তাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা হল।[৩৪]
এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার আছে।

মোটকথা মহানবী স. তাঁর বিচার কার্যক্রমে বাদী-বিবাদী উভয়ের বক্তব্য শোনতেন। তিনি আলী রা. কে বিচারক নিয়োগ করার সময় তার উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ "তোমার নিকট যখন দুই ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করে তখন অপর জনের কথা না শোনা পর্যন্ত প্রথম জনের কথার ভিত্তিতে ফয়সালা দিবে না।"[৩৫]

**৪, সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন**
মহানবী স. স্বীয় বিচারকার্যে বাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার নির্দেশ দিতেন। মহানবী স. বলেন- "মানুষ দাবি করলেই যদি সব কিছু দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তারা কোনো কওমের রক্ত ও সম্পদ দাবি করে বসবে। কিন্তু যে বাদী তাকে দলীল-প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং যে তা অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে"।[৩৬]

সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যারা ইনসাফের সাথে সাক্ষ্য দেয় মহানবী স. সেসব লোকের সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দিতেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে- "এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও"।[৩৭]
সাক্ষীর মাপকাঠি সম্পর্কে মহানবী স. বলেন, "বিশ্বাস ভঙ্গকারী প্রতারক পুরুষ ও নারী এবং হদ্দের শাস্তি প্রাপ্ত পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা বৈধ নয়"।[৩৮]
মহানবী স. সাক্ষ্য দেয়ার জন্য লোকনজনকে উদ্বুদ্ধ করতেন। মহানবী স. তাঁর সাহাবীগণকে কোনো বিষয়ে সাক্ষী তলব করার আগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। যেমন রসূল স. বলেন, "তোমাদেরকে কি আমি উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে অবহিত করব না? উত্তম সাক্ষী হল সেই ব্যক্তি, যাকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানালে সাথে সাথে এগিয়ে আসে"।[৩৯]

---

[৩৪] ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফির রাজ্ম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৪৮
[৩৫] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফিল কাদি লা ইয়াকদি বায়নাল খাসমাইনে হাত্তা ইয়াসমাআ কালামাহুমা, আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯, হাদীস নং ১৩৩১
[৩৬] ইমাম মুসলিম, *সহীহ আল-মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আকদিয়া, অনুচ্ছেদ : আল-ইয়ামিনু আলাল মুদ্দাআ আলাইহি, আল-কাহেরাঃ দারুল হাদীস, ১৯৯৭, খ. ৩ পৃ. ১৯৩, হাদীস নং- ১৭১১।
[৩৭] আল-কুরআনঃ ৬৫ ঃ ২
[৩৮] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাহ, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফিমান লা তাজুযু শাহাদতুহু, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭৯, হাদীস নং ২২৯৮।
[৩৯] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আকদিয়া, অনুচ্ছেদ ঃ বায়ানু খাবরিশ শুহুদ, বৈরূত : দারুল মাআরেফা ২০০১, খ. ১২, পৃ. ২৪৩, হাদীস নং ৪৪৬৯

সাক্ষীর মাধ্যমে বিচার কার্যক্রমে বিচারকের উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন সহজ হয়। এ বিষয়ে তিনি বিচারকদেরও সাক্ষী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বলেন ঃ "বিচার-ফয়সালা হল জ্বলন্ত অংগারবিশেষ। অতএব সেই অংগারটি তোমা হতে অপসারণ কর দু'টি কাঠি দ্বারা"[৪০] হুসামুদ্দীন বুখারী বলেন, "দু'টি কাঠি অর্থ দু'জন সাক্ষী"।[৪১] অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, মহানবী স. জনৈক ব্যক্তির সফর অবস্থায় মৃত্যুকালীন ওসিয়াত অনুসারে সম্পদ তার ওয়ারিসদের নিকট ফেরৎ দেয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে অমুসলিমদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।[৪২]

### ৫. শপথ করানো

মহানবী স. এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে মানুষ আল্লাহভীতি বা তাকওয়াকে তাদের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সেজন্য আল্লাহ্র নামে শপথ করানোর মাধ্যমেও তিনি ফয়সালা দিতেন, সাক্ষীদেরকেও শপথ করাতেন এবং বিবাদীদেরকেও শপথ করাতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স. এ মর্মে ফয়সালা দিয়াছেন, বিবাদী শপথ করবে।"[৪৩]

সাক্ষীর শপথের ব্যাপারে আবূ হুরায়রা রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স. একজন সাক্ষীর শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা দিয়েছেন"[৪৪]

আলকামা তাঁর পিতা ওয়াইল রা. সূত্রে বলেন, হাদরামাওতের এক ব্যক্তি এবং কিনদার এক ব্যক্তি নবী করীম স. এর নিকট আসল। হাদরামাওতের লোকটি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ লোকটি আমার একখন্ড জমির উপর চড়াও হয়েছে। কিনদার লোকটি বলল, এটা আমার সম্পত্তি, আমার দখলে আছে। এতে তার কোনো স্বত্ব নেই। নবী করীম স. হাদরামী লোকটিকে বললেন, তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তা হলে তোমাকে তার (বিবাদীর) শপথের উপর নির্ভর করতে হবে। লোকটি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ লোকটি তো ফাসিক। কিসের শপথ করছে তাতে সে কোনো পরওয়াই করবে না। সে তো বিন্দুমাত্র পরহেযগারী অবলম্বন করবে না। তিনি বললেন, এটা ছাড়া তুমি তার নিকট হতে আর কিছু পেতে

---

[৪০] আবূ বাকর মুহাম্মদ ইবনে আবূ সাহল আহমাদ শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, করাচী: ১৯৮৭, খ. ১৬, পৃ. ৬৪

[৪১] *শারহু আদাবিল কাদী* লিল-খাস্সাফ, তা.বি. খ. ১, পৃ. ১৪৯

[৪২] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : শাহাদাতু আহলিয যিম্মা ওয়া ওসিয়াত ফিস-সফর, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৭

[৪৩] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ ঃ মা জাআ ফি আন্নাল বায়্যেনাতা আলাল মুদ্দায়ী ওয়াল ইয়ামিনু আলা মান আনকারা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৪, হাদীস নং ১৩৪২

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫, হাদীস ১৩৪৫

পার না। ওয়াইল রা. বলেন, লোকটি শপথ করে পিছনে ফিরলে রসূলুল্লাহ স. বললেন : এ ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে তোমার সম্পদ গ্রাস করে থাকে তবে সে এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবেন।[৪৫]

**৬. স্বীকারোক্তি**

মহানবী স. এর সময়ে অনেকেই নিজের অপরাধ স্বীকার করতো। মহানবী স. এর বিচার কার্যক্রম আলোচনায় আমরা দেখি যে, তিনি অপরাধীদের স্বীকারোক্তি আইনগতভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তার ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন। জাবির রা. বলেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী স. এর কাছে এসে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিল। নবী স. তাকে এড়িয়ে গেলেন, সে চারবার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। নবী স. তাকে বললেন, তোমার মধ্যে কি কোন পাগলামী আছে? সে বলল, না। রসূল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। অত:পর নবী স. তাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ দিলেন।[৪৬]

**৭. পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা ও মাঠ পর্যায়ে খোঁজ-খবর নেয়া**

মহানবী স. তাঁর বিচার কার্যক্রমে অভিযুক্ত ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকতাও যাচাই করতেন। মাইয আল-আসলামীর ঘটনা হতেও এটা বুঝা যায়। তিনি যখন তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি প্রার্থনা করলেন তখন রসূলুল্লাহ স. তার পরিবারের লোকজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোকটির মাঝে কি কোন পাগলামী আছে? তারা বলল, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। মহানবী স. আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত না অবিবাহিত? সে উত্তর দিল, আমি বিবাহিত। তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে রজম করবার নির্দেশ দিলেন। অনুরূপভাবে যেনার মাধ্যমে যে মহিলাটি গর্ভবতী হয়েছিল এবং অপরাধ স্বীকার করেছিল, তিনি তাকে সরাসরি হত্যা করেননি, বরং গর্ভস্থ বাচ্চাটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দুধপানের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। এভাবে অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান। অনুরূপভাবে দেওয়ানী বিষয়ে কোনো বিবাদ দেখা দিলে মহানবী স. যথাসম্ভব মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিতেন। যেমন আল-কাত্তানী উল্লেখ করেন, যুবায়র ইবনুল আওয়ামের সাথে এক আনসার পানির নালা নিয়ে যে বিবাদ করেছিল মহানবী স. সেখানে হাযির হয়ে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৪৭]

---

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩, হাদীস নং ১৩৪০

[৪৬] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আল-হুদুদ, অনুচ্ছেদ : আর-রজম বিল-মুসাল্লা, আল-কাহেরাঃ দারুত তাকওয়া. ২০০১ খ. ৩, পৃ. ৪০০, হাদীস নং- ৬৩২১।

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

### ৮. সন্দেহের সুযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তি ভোগ করবে

মহানবী স. এর নীতি ছিল সন্দেহযুক্ত অবস্থায় যতদূর সম্ভব মুসলমানগণকে দন্ড হতে অব্যাহতি দান করা, অভিযোগ হতে রেহাই দানের উপায় থাকলে তাকে ছেড়ে দেয়া। আয়েশা রা. বর্ণিত হাদীসে মহানবী স. বলেন ঃ "তোমরা যথাসম্ভব মুসলিমদের হতে হদ্দ প্রতিহত করবে। কোনো উপায় থাকলে তাকে তার পথে ছেড়ে দাও। কারণ ইমাম বা কর্তৃপক্ষের ভুল করে শাস্তি প্রদান করার তুলনায় ভুল করে ক্ষমা করা উত্তম"।[৪৮]

### ৯. প্রতিনিধি নিয়োগ

আল্লামা আল-কাত্তানী আহকামুল কুরআন-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন, রসূলুল্লাহ্ স. উম্মে হাবীবা বিনতে আবী সুফ্য়ানকে বিবাহের ব্যাপারে নাজাশীর নিকট আমর ইবনে উমায়্যা আদ-দামরীকে উকীল নিয়োগ করেছিলেন এবং মায়মূনা রা. কে বিবাহের ব্যাপারে আবূ রাফে' রা. কে উকীল নিয়োগ করেছিলেন।[৪৯]

তবে এটা ছিল বিবাহ্ সম্পাদনের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মাঝে কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত। কিন্তু বিচার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মহানবী স. এর সময়ে সাধারণত উকীল নিয়োগ করার প্রথা ছিল না।

### ১০. রায় ঘোষণা

মহানবী স. বিচার কার্যক্রম নীতিমালায় রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষ রাখতেন -
ক. ইনসাফপূর্ণ হওয়া।
খ. শরীয়া ভিত্তিক হওয়া।

কারণ রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। মহানবী স. কিতাবুল্লাহর ভিত্তিতে ফয়সালা দিতেন। মহানবী স. কর্তৃক নিয়োগকৃত বিচারকগণ কুরআন-সুন্নাহ্তে রায়ের ভিত্তি পাওয়া না গেলে সেই ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামতের আলোকে সার্বিক দিক বিবেচনা করে রায় ঘোষণা করতেন। শরীয়াবিরোধী কোন রায় তারা ঘোষণা করতেন না।

মহানবী স. বলেন, "নিশ্চয় আমি হালালকে হারাম ঘোষণা করি না এবং হারামকে হালাল ঘোষণা করি না।"[৫০]

উম্মে সালামা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন: "নিশ্চয় বিচারকের ফয়সালা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করতে পারে না।"[৫১]

---

[৪৮] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদুদ, অনুচ্ছেদ ঃ মা জাআ ফি দারয়িল হুদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩, হাদীস নং- ১৪২৪।

[৪৯] আল-কাত্তানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

[৫০] ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, আল-কাহেরা: দারুত তাকওয়া, ২০০০, খ. ৯ পৃ. ২৭৪।

[৫১] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মান কুদিয়া লাহু বিহাক্কি আখীহি ফালা ইয়াখুযুহু, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪২৮, হাদীস নং ৬৬৯২।

রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে রায়ের যৌক্তিকতা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পর্কে মহানবী স. নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রায় ঘোষণা করতেন না। তিনি বলেন, "দিবালোকের মত দেখে থাকলে তুমি সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় বিরত থাক।"[৫২]

মহানবী স. সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তি, বাদী-বিবাদীর বক্তব্য ও বক্তব্যের তাৎপর্য, আলামত ও দলীল-প্রমাণ ইত্যাদি সব কিছু দেখে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। অনুরূপভাবে মহানবী স. কর্তৃক নিয়োগকৃত বিচারকগণও বিচারকার্য সম্পাদন করতেন।

মহানবী স. এর যুগে আলামতের উপর ভিত্তি করেও ফয়সালা দেয়ার অনেক উদাহরণ আছে। যেমন ঃ বনী কুরায়যার ব্যাপারে সাদ ইবনে মু'আয রা. ফয়সালা দিয়েছিলেন, যুদ্ধে সক্ষম সকল বালেগ পুরুষকে হত্যা করা হোক। পরে কতক বন্দীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পূর্বে অভিযোগ করা হয় যে, কেউ কেউ বালেগ নয়। তখন সাহাবায়ে কিরামকে ঐ বন্দীদের বালেগ কিংবা নাবালেগ তা পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হল, তখন ঐভাবে আলামতের ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা দেয়া হয়।[৫৩]

### ১১. রায় পুনর্বিবেচনার অনুমতি

মহানবী স. এর বিচার প্রক্রিয়ায় আপিল করার অনুমতি ছিল। এ পর্যায়ে কোনো আঞ্চলিক বিচারালয়ে ফয়সালা হলে কেউ কেউ উচ্চ আদালত তথা মহানবী স. এর আদালতের দ্বারস্থ হতো। আলী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। এক সম্প্রদায় সিংহ শিকারের জন্য উচ্চ ভূমিতে গর্ত খনন করল এবং একটি সিংহ সেই গর্তে পড়ে হলো। একটি লোক সেই গর্তে পড়ে যায় এবং সে আরেকটি লোককে ধরার কারণে সে ও গর্তে পড়ে গেল এবং ধরাধরি করতে করতে অপর আরও দু'জন সেখানে পড়ে গিয়ে চারজন হয়ে গেল। সিংহ তাদের আঘাত করলে তারা নিহত হলো। ঐ সম্প্রদায়ের লোকজন অস্ত্র ধারণ করল এবং তাদের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো। আলী রা. বললেন, আমি তাদের নিকট এসে বললাম, তোমরা চার ব্যক্তির জন্য দু'শত ব্যক্তিকে হত্যা করবে? তোমরা আস, আমি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেব। তোমরা যদি তাতে সন্তুষ্ট থাক তা হলে এটাই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা বলে ধরে নেব। যদি তোমরা অস্বীকার কর তবে তোমরা রসূলুল্লাহ স. এর নিকট এটা উত্থাপন করতে পার। আর তিনিই বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন, প্রথম ব্যক্তির জন্য দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ, তৃতীয় ব্যক্তির জন্য অর্ধেক এবং চতুর্থ ব্যক্তির জন্য পূর্ণ দিয়াত।

---

[৫২] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫৬।

[৫৩] কাযী বুরহানুদ্দীন ইবনে ফারহূন, *তাবসিরাতুল হুক্কাম ফী উসূলিল আকদিয়াতে ওয়া মানাহিজিল আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৩।

তিনি ঐ দিয়াত ঐ চার গোত্রের উপর ধার্য করেন যারা গর্তের কিনারায় উপস্থিত হয়েছিল। এ ফয়সালায় তাদের কেউ অসন্তুষ্ট হল এবং কেউ সন্তুষ্ট হল। অত:পর তারা রসূলুল্লাহ স. এর দরবারে আগমন করল, তারপর ঘটনাটি তাঁর নিকট বর্ণনা করলো। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করব। একজন বলল, আলী রা. আমাদের মাঝে ফয়সালা করেছেন। আর আলী রা. যেভাবে ফয়সালা করেছেন সে তা বর্ণনা করল। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আলী রা. যা ফয়সালা করেছে সেটাই ফয়সালা।[৫৪] এভাবে তিনি উচ্চ আদালতে আঞ্চলিক আদালতের রায় বহাল রাখলেন।

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী স. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রা. কে বনী জাযিমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। সেখানে পৌছে খালিদ রা. তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা দাওয়াত কবুল করেছিল কিন্তু তাঁকে তা বুঝিয়ে বলতে পারল না। তারা বলল, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ তাদের কতককে হত্যা ও কতককে বন্দী করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে একদিন তিনি আমাদের সবাইকে আদেশ দিলেন আমরা যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করি। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীদের হত্যা করবে না কারণ ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত। অবশেষে আমরা নবী করীম স. এর নিকট ফিরে আসলাম। আমরা তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। নবী করীম স. দুই হাত তুলে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তার দায় হতে মুক্ত। এই কথাটি তিনি দু'বার বললেন"।[৫৫]

ইমাম বুখারী এই হাদীসটি একই গ্রন্থে কিতাবুল আহাকামেও বর্ণনা করেন এবং এর অনুচ্ছেদের শিরোনাম লিখেন- "বিচারক যদি অন্যায়ভাবে বা বিশেষজ্ঞ আলিমগণের বিপরীত রায় প্রদান করেন তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।"[৫৬]

মোটকথা, মহানবী স. উচ্চ আদালতে আপিল করার সুযোগ রেখেছিলেন। তিনি কখনো নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখতেন, আবার কখনো তা বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে রায় প্রদান করতেন কিংবা নিম্ন আদালতের রায়কে বাতিল ঘোষণা করতেন।

### ১২. রায় কার্যকরণ

রায় ঘোষণার পর তা বাস্তবায়নে লক্ষ্যে মহানবী স. নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন -

১. শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাদীকে এখতিয়ার প্রদান।

---

[৫৪] ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৭৫।

[৫৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ ঃ বাআছান্নাবিয়ু খালেদাবনাল ওয়ালিদে ইলা বানি জাযিমা, ২০০৫, খ. ৭, পৃ. ১৭৬, হাদীস নং ৪০০৩

[৫৬] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : ইযা কাদাল হাকিমু বিজাউযিন আওখিলাফিন আহলিল ইলম ফাহুয়া রাদদুন, ২০০৫, খ. ১০, পৃ. ৪৩২, হাদীস নং ৬৬৯

২. তাওবার আহ্বান।
৩. বিভিন্ন প্রকার শাস্তি কার্যকরকরণ।
৪. শাস্তি প্রয়োগ না করার সুপারিশ নিষিদ্ধকরণ।

ক. মহানবী স. কখনো অপরাধীকে বাদীর নিকট সোপর্দ করতেন এবং শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাদীকে এখতিয়ার প্রদান করতেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করল তাকে নিহতের অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে আর ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে।"[৫৭]

আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এর যুগে জনৈক ব্যক্তি নিহত হলে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওলীগণের নিকট সোপর্দ করা হয়। হত্যাকারী বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাকে হত্যা করতে চাই নি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে এবং এমতাবস্থায় তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন সে লোকটি হত্যাকরীাকে ছেড়ে দিল।[৫৮]

মহানবী স. যথাসম্ভব অভিযুক্তকে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি হতে মুক্তি দেয়ার জন্য চেষ্টা করতেন। কোনো যৌক্তিক পথ আছে কিনা এজন্য তিনি বারবার বলতেন ঃ "হদ্দ হতে মুক্তি দেয়ার কোন সুযোগ থাকলে তোমরা হদ্দ প্রতিহত করো।"[৫৯]

বিচার কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে মহানবী স. অপরাধীকে যথাসম্ভব মাফ করে দেয়ার জন্য সাহাবীগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন, যদি অপরাধীর অন্যান্য দিক ভালো থাকত বা ভালো আশা করা যেত। এ ব্যাপারে মহানবী স. বলেন ঃ "কোনো ব্যক্তি যদি তার শরীরে আঘাত পায় আর সে তা মাফ করে দেয় তবে এতে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"[৬০]

### খ. তাওবার আহ্বান

কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহানবী স. অপরাধীকে তাওবার আহ্বান জানিয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে। আবূ উমায়্যা আল-মাখযূমী রা. হতে বর্ণিত। মহানবী স. নিকট এক চোরকে ধরে আনা হলো, সে তার চুরির অপরাধ স্বীকার করলো। কিন্তু তার সাথে চুরিকৃত কোন দ্রব্য পাওয়া গেল না। মহানবী স. তাকে বললেন ঃ তোমার ভাইয়ের

---

[৫৭] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ ঃ মা জাআ ফিদদিয়াতে কামহিয়া মিনাল ইবিল, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৪, হাদীস নং ১৩৮৭

[৫৮] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফি হুকমি ওয়ালিয়্যিল কাতীলে ফিল কিসাসে ওয়াল আফবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২, হাদীস নং- ১৪০৭।

[৫৯] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : আল-আফয়ুয়ানিল হুদূদ, আল-কাহেরা: দারুল হাদীস, ১৯৯৯, খ. ৪, পৃ. ১৮৭১, হাদীস নং- ৪৩৭৬।

[৬০] প্রাগুক্ত।

দ্রব্য তুমি চুরি করেছ? সে বলল, হাঁ। মহানবী স. এভাবে দু'বার কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর মহানবী স. এর নির্দেশে তার হাত কাটা হল, অতঃপর তাকে রসূলুল্লাহ্ স. এর নিকট নিয়ে আসা হল। তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। সে বলল, আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাই এবং তাওবা করছি। অনন্তর মহানবী স. তিনবার বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তার তাওবা কবুল করো।

### গ. শাস্তি কার্যকরকরণ

মহানবী স. এর সময়ে আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ পৃথক ছিল না। সুতরাং তিনি বিচারক হিসেবে ফয়সালা করে প্রধান নির্বাহী হিসেবে বিচারের রায় কার্যকরও করতেন। মহানবী স. সরাসরি যে সমস্ত শাস্তি কার্যকর করেছিলেন তার কয়েকটি নিম্নরূপ -

### ১. মৃত্যুদন্ড

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ওলী বিনিময় গ্রহণে সম্মত না হলে কিংবা ওলী না থাকলে মহানবী স. মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছেন। যেমন তিনি পাথর নিক্ষেপে এক ইয়াহূদীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি ব্যভিচারের অপরাধে একাধিক পুরুষ ও মহিলার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি ব্যভিচারের অপরাধে এক মহিলাকে রজম বা পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন, এমনকি তিনি নিজেও পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন।[৬১]

### ২. চুরির অপরাধে হস্তকর্তন

মহানবী স. এর সময়ে একটি চুরির ঘটনা ঘটে। অপরাধী ধরা পড়ে এবং অপরাধ প্রমাণিত হয়। তিনি চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের হাত কাটা হয়েছে। যেমন- একবার মাখজুমী গোত্রের এক কুরাইশী মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। নবী করিম স. তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ শুনে লোকজন খুব পেরেশান হয়ে পড়লো। কারণ সেই মহিলা ছিলো সম্ভ্রান্ত গোত্রের। তারা উসামা রা. কে বলে সুপারিশ করতে পাঠালেন নবী করিম স. এর কাছে। যখন তিনি রসূল করীম স. এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বললেন তখন তিনি বললেন, হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা না করার ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছো? তখন উসামা ইবনু যায়িদ ভয় পেয়ে বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়েছে।" অত:পর নবী করিম স. মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। প্রথমে

---

[৬১] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : ফিল মারআতি আল্লাতি আমারান নাবিউ স. বি রাজমিহা মিন জুহাইনা, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৭৯, হাদীস নং ৪৪২৯

আল্লাহর হামদ ও সানা পেশের পর বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আজ যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তবে আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম"।[৬২]

### ৩. বেত্রাঘাত ও নির্বাসন

অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে মহানবী স. ১০০টি বেত্রাঘাত এবং এক বৎসরের নির্বাসনের শাস্তি কার্যকর করেন। তিনি নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কিংবা দুই পায়ের জুতা দ্বারা চল্লিশটি আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৬৩]

### ৪. আটকাদেশ ও বন্দী করা

মহানবী স. অপরাধীদের জন্য কোনো বন্দীশালা প্রতিষ্ঠা না করায় কোনো কোনো অপরাধীকে মসজিদের পাশে বেঁধে রাখা হয়েছিল। যেমন বনী হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্‌নে উসালকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে তিনদিন বেঁধে রাখা হয়েছিল।[৬৪] সুনান আবী দাউদে উল্লেখ আছে, বাহ্‌য ইব্‌নে হাকীম রা. বলেন, হত্যার অপরাধে রসূলুল্লাহ্ স. আমার গোত্রের কতক লোককে বন্দী করেছিলেন।[৬৫] তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার অপরাধে তিনি এক ব্যক্তিকে বন্দী করেছিলেন, পরে তাকে ছেড়ে দেন।[৬৬]

মহানবী স. ঋণগ্রহীতা যথাসময়ে ঋণ আদায় না করার কারণে তাকে সার্বক্ষণিক নজরে রাখার জন্য ঋণদাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন- যা এক প্রকার নজরবন্দী। এমনিভাবে যাবজ্জীবন বন্দী করার অনুমতি বা নির্দেশ মহানবী স. এর বিচার ব্যবস্থায়

---

[৬২] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায়: আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ: কারাহিয়াতুশ শাফাআতি ফিল হাদ্দে, অনু: প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২১৩, হাদীস নং ৬৩৩১

[৬৩] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ: মাযাআ ফিন নাফিয়ি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬২, হাদীস নং ১৪৩৮

[৬৪] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আল-ইগতিছালে ইযা আসলামা ওয়া রাবাতিল আছিরে আইদান ফিল মাসজিদ, অনু:, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-২৫২, হাদীস নং ৪৪৮।

[৬৫] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : আদ-দায়নু হাল ইয়ুহবাসু বিহি, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৪৩, হাদীস ৩৬২৫

[৬৬] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : মাযাআ ফিল হাবসি ফিত তুহমাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৮, হাদীস নং ১৪১৭, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬২-৬৩

ছিল যা এমনকি আল-কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "তবে তাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়।"[৬৭]

### ৫. শাস্তি প্রয়োগ না করার জন্য সুপারিশ নিষিদ্ধ

মহানবী স. যখন বিচার কার্যক্রম চূড়ান্ত করতেন তখন শাস্তি প্রয়োগের সময় সুপারিশ গ্রহণ করতেন না। যেমন মাখযূম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করলে মহানবী স. তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। তার নিকট শাস্তি মওকুফ করার জন্য সুপারিশ করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং সুপারিশকারীকে বলেন, "তুমি কি আমার কাছে আল্লাহ্র নির্ধারিত হদ্দসমূহের কোন একটি হদ্দ মওকুফের সুপারিশ করছো?"[৬৮]

মহানবী স. এর বক্তব্য ছিল, অপরাধীকে ক্ষমা করতে চাইলে আমার নিকট মোকদ্দমা পেশ করার আগেই করো। বর্ণিত আছে, তিনি বলেছিলেন ঃ "শর'ঈ শাস্তি আরোপিত হতে পারে এ ধরনের অপরাধ তোমাদের নিজেদের মধ্যে আপোসে ক্ষমা কর, কিন্তু যা শরঈ শাস্তি হিসেবে আমার নিকট পৌঁছেছে তা অবধারিত হয়ে গেছে।"[৬৯]

বর্ণিত আছে যে, একবার মহানবী স. এর কাছে এক চোর ধরে আনা হল। তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দেয়ার পর কাঁদতে লাগলেন। কেউ বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন, কেন কাঁদব না! তোমাদের সামনে আমার উম্মতের হাত কাটা হচ্ছে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন না? তিনি বললেন ঃ

"খারাপ শাসক তো সেই ব্যক্তি যে আরোপিত হদ্দসমূহ ক্ষমা করেছে। কিন্তু তোমরা একজন অপরজনকে ক্ষমা করতে পারো।"[৭০]

এসব বক্তব্য ও অবস্থা হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী স. এর লক্ষ্য ছিল মানুষের সংশোধন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া নয়। বাধ্য হয়ে যা দিতে হয় তা সমাজের প্রয়োজনে এবং শৃংখলা বিধান করার জন্য এবং সীমা লংঘনকারীদের নিকট হতে অন্যের অধিকার আদায় করে দেয়ার জন্য।

---

[৬৭] আল-কুরআন, ৪ঃ১৫

[৬৮] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ ঃ হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করা ঠিক নয়, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৫

[৬৯] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : ইউফা আনিল হুদুদি মালাম তাবলুগুস সুলতান, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২৭, হাদীস নং ৪৩৬৬

[৭০] ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরূতঃ দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৪০৫, খ. ১২, পৃ. ৮৭

## উপসংহার

'দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন' বিচারের লক্ষ্য হলেও দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমন-ই অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয়। এর মূল কারণ হচ্ছে, বিচারব্যবস্থায় ইসলামী বিচার পদ্ধতির বাস্তবায়নের অনুপস্থিতি। কারণ ইসলামের ন্যায়বিচারই নিশ্চিত করতে পারে মানুষের সকল অধিকার। ইসলামের স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও ইনসাফপূর্ণ বিচারব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা করতে পারে অশান্তিপূর্ণ সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা। ইসলামী বিচার পদ্ধতি যেমন বাদীকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে পারে তেমনি বিবাদীকেও রক্ষা করতে পারে বিচারের নামে অবিচারের হাত থেকে। যার বাস্তব নমুনা হচ্ছে রসূলুল্লাহ স. প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে গৃহীত বিচার কার্যক্রম ও তার বিভিন্ন পদ্ধতি।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩০
এপ্রিল-জুন : ২০১২

# প্রচলিত ও ইসলামী আইনে উপার্জন প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম*

*[সারসংক্ষেপ: প্রত্যেক ব্যক্তির জীবিকার জন্য প্রয়োজন কর্মের। প্রতিটি মানুষই তার যোগ্যতানুযায়ী কাজ করে। সকল মানুষেরই জন্মগতভাবে কমবেশি কর্মদক্ষতা ও প্রতিভা আছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে অকর্মণ্য, নিষ্ক্রিয় ও অকেজো করে রাখার অধিকার কারো নেই। নবী-রসূলগণকেও জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ অর্থ ছাড়া অর্জন করা যায় না। অর্থসম্পদ উপার্জনে ইসলাম সকল মানুষকে উৎসাহিত করে। উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। জীবন এবং সম্পদ একটি অপরটির পরিপূরক। সম্পদ ছাড়া যেমন জীবনধারণ সম্ভব নয়, তেমনি প্রাণহীন ব্যক্তির জন্য অর্থেরও কোন মূল্য নেই। অর্থসম্পদ মানুষের কল্যাণের জন্য কিন্তু এ সম্পদই আবার কখনোও কখনোও অকল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। বিত্ত-বৈভব যেমন মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অনুরূপভাবে তা আবার মানুষের ক্ষতিকর কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলাম ছাড়া সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে যে সকল রীতিনীতি অনুসৃত হচ্ছে, তার সবগুলোই সম্পদ সঠিক ব্যবহার ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পেরেছে এমনটি জোর দিয়ে বলা যায় না। অত্র প্রবন্ধে সম্পদ-এর পরিচয়, সম্পদ উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা বিশেষত বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।]*

**সম্পদ-এর পরিচয়**

জাস্টিনিয়ান তাঁর ইনস্টিটিউটস্ এ রেসকে (Res) দ্বিতীয় শ্রেণীর আইন হিসেবে অভিহিত করেছেন। রেস শব্দটির প্রতিশব্দ হলো বস্তু। এর দু'টি অর্থ রয়েছে। সাধারণ অর্থে যে সকল বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলোই রেস; যেমন : টেবিল, চেয়ার, বাড়ি, একখণ্ড জমি ইত্যাদি।[১]

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

১. Lee, R.W., *The Elements of Roman Law*, London : Sweet & Maxwell Limited, 1956, P. 134; ড. এবিএম মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী, রোমান আইনের মূলনীতি, ঢাকা : মল্লিকা পাবলিশিং হাউস, ২০০৫, পৃ. ১২৭-১২৯।
Muirhead James, *Historical Introduction to the Private Law of Rome*, (London : Adam & Charles Black, 1899), P. 245; Leage, R.W., Prichard,

তবে আইনবিদদের মতে রাস্তায় চলার অধিকার ও দেনা ইত্যাদিও বস্তুর মধ্যে গণ্য। এ প্রসঙ্গে রোমান আইনে[২] W.W. Buckland এ দিকেই লক্ষ করে বলেছেন : আইন দ্বারা সংরক্ষিত যে কোনো বস্তু, যার অর্থনৈতিক মূল্য ছিল, তাকেই রেস বলা হতো।[৩]
সম্পদ শব্দের অর্থ (Meanings of the term 'Property') সকল আইনগত অধিকার, মালিকী অধিকার, সর্বজন স্বীকৃত মালিকী অধিকার ইত্যাদি।[৪]

### সম্পদ উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা

সাধারণভাবে উপার্জনের অনেক প্রকার থাকতে পারে, তবে মৌলিক দিক থেকে মানুষের উপার্জনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. বৈধ পন্থায় উপার্জন এবং খ. অবৈধ পন্থায় উপার্জন। নিম্নে এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো -

**ক. বৈধ পন্থায় উপার্জন :** বৈধ পন্থায় উপার্জনের জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম শর্ত হলো, বান্দার হালাল উপার্জন। কেননা রিযিক যদি হালাল পন্থায় উপার্জিত না হয় তাহলে তার কোনো দুআ কিংবা ইবাদত কোনটাই কবুল হয় না। আল্লাহ্ আমাদেরকে হালাল রিযিক দিয়ে জীবনধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : "আমি তোমাদের জন্য যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর।"[৫] আর বৈধ পেশায় নিয়োজিত থেকে সম্পদ উপার্জনের জন্য পবিত্রতম ও হালাল বস্তুর খোঁজ করার নির্দেশও আল্লাহ্ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : "হে মুমিনগণ! জুমুআর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে

---

A.M., Leage's Roman Private Law, (London : Macmillan & Co. Ltd., 1961), P. 256; Nicholas, Berry, An Introduction to Roman Law, (London : Oxford University Press, 1962), P. ৪২১.

২. রোমান আইন : প্রাচীন রোমে যেসব নিয়ম কানুন বা আইন প্রচলিত ছিল তাই রোমান আইন। এটি কোনো প্রণীত আইন নয় বা এটি একক কোনো আইনও নয়। রোমানদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচলিত প্রথাসমূহ এবং সভ্য জাতি হিসেবে তারা যেসব নিয়ম-নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হতো এবং তাদের ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং বৈষয়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে তারা যেসব নিয়ম কানুনের প্রবর্তন করেছিল প্রকৃতপক্ষে তাকেই রোমান আইন বলা হয়ে থাকে।-নির্মলেন্দু ধর, *রোমান আইন*, ঢাকা : রেমিসি পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ১।

৩. ড. এবিএম মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী, *রোমান আইনের মূলনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৯।

৪. আজিজুর রহমান চৌধুরী, *ব্যবহার-তত্ত্ব (আইন বিজ্ঞান)*, ঢাকা : বাংলাদেশ 'ল' বুক সেন্টার, ২০০৪, পৃ. ২২৭; Leage, R.W., Prichard, A.M., *Leage's Roman Private Law*, London : Macmillan & Co. Ltd., 1961, P.125; Nicholas, Berry, *An Introduction to Roman Law*, London : Oxford University Press, 1962, P. 214.

৫. আল-কুরআন, ২ : ৫৭.. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ.

ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেল। বল, আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।"[৬]

এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "পৃথিবী মিষ্ট ও শ্যামল। এখানে যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করবে এবং ন্যায়সংগত পথে তা ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং তাকে জান্নাত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবে এবং অন্যায় পথে ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তাকে অপমানজনক স্থানে নির্বাসিত করবেন। আর যারা হারাম সম্পদ হস্তগতকারী, কিয়ামতের দিন তারা আগুনে জ্বলবে।"[৭] এভাবে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং হালাল পন্থায় উপার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিম্নে বৈধ পন্থায় উপার্জনের কতিপয় মাধ্যম উপস্থাপন করা হলো -

### ১. চাকরি

সম্পদ উপার্জনের জন্য মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করে তা আহরণ করতে হয়। আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের জন্য যেমন মান্না[৮] ও সালওয়া[৯] নাযিল করতেন তেমনটি এ যুগে আর হবার সম্ভবনা নেই।[১০] মুসলিম উম্মাহকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পদ

---

৬. আল-কুরআন, ৬২ : ৯-১১। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

৭. খাওলাহ বিনতে কায়িস রা. হতে বর্ণিত :

خولة بنت قيس بن قهد تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بورك له فيها ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة.

-ইব্নে হিব্বান, *আস-সহীহ্*, দারুল ফিক্র, তা.বি., খ. ১০, পৃ. ৩৭০, হাদীস নং-৪৫১২

৮. 'মান্না' এক ধরনের সুস্বাদু খাবার, যা শিশিরের মত গাছের পাতায় ও ঘাসের উপর জমে থাকত। আল্লাহ্ বিশেষভাবে তা বনী ইসরাঈলের জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

৯. 'সালওয়া' পাখির গোশ্ত জাতীয় এক প্রকার খাদ্য, যা আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের জন্য বিশেষভাবে প্রেরণ করেছিলেন।

১০. বনী ইসরাঈলদের উপর আল্লাহ্ এমন এক খাবার নাযিল করতেন যাকে কুরআনের ভাষায় মান্না ও সালওয়া বলা হতো এবং তারা তা লাভ করতো বিনা পরিশ্রমে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

উপার্জনের শিক্ষা রসূলুল্লাহ্ স. দিয়েছেন। এজন্য মানুষকে পরিশ্রমের জন্য নিত্য নতুন উপায় বের করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। তন্মধ্যে একটি হলো চাকরি করা এবং নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। চাকুরীর ক্ষেত্র হালাল হতে হবে। হারাম কোনো কাজে চাকরি নিয়ে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে তা কখনই হালাল হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "আর মানুষ প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারে না।" আর এই যে মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। আর এই যে, তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে। তারপর তাকে পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে।"[১১] এ আয়াতের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "নিজ হাতের উপার্জন মানুষের উত্তম খাদ্য। আর সন্তান মানুষের নিজ হাতের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।"[১২]

## ২. কৃষি কাজ

সাওয়াব লাভের জন্য যেমন সৎ কাজ ও সাধনা জরুরী, তেমনি সম্পদ লাভের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ জরুরী। এ জন্য নিজের ভাগ্যকে নিজে গড়ার লক্ষে মানুষকে কষ্ট করে রিযিকের ব্যবস্থা করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[১৩]

উপার্জনের অন্য আরেকটি মাধ্যম হলো কৃষি কাজ। আদম আ. এ কৃষি কাজ করেছেন। এটি একটি উন্নত পেশা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে নিয়ে ফসলহীন উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করলাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন

---

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি নাযিল করলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া'। তোমরা সে পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর তারা আমার প্রতি জুলুম করেনি, বরং তারা নিজদেরকেই জুলুম করতো।"-আল-কুরআন, ২ : ৫৭

১১. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩৯-৪১: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى.

১২. আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত : عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : ان اطيب ما أكل الرجل من كسبه ولن ولده من كسبه –*মুসনাদে আহমাদ*, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ৩১, হাদীস নং-২৪০৭৮; *আত-তাবারানী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৮০, হাদীস নং-৪৪৮৬

১৩. আল-কুরআন, ১৩ : ১১ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে।"[১৪]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "তিনি সেই সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা জন্তু চরাও। তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যায়তুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সকল ফল-ফলাদি। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে"। [১৫]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন : "কোন মুসলমান যখন কোন কিছু রোপণ করে অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ অথবা কোন চতুষ্পদ জন্তু কোন কিছু ভক্ষণ করে তা রোপনকারীর জন্য সদকার সমতুল্য সাওয়াব হয়।"[১৬]

আবূ আইউব আল-আনসারী রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন বৃক্ষ রোপণ করলো আল্লাহ্ তার জন্য একটি প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন সে গাছ থেকে ফল বের হোক বা না হোক।"[১৭]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় কৃষি কাজকে সদকায়ে জারিয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আনাস রা. বলেন; রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : সাতটি বিষয়ে আমলের প্রতিদান মৃত ব্যক্তির কবরেও প্রদান করা হবে। তা হল, জ্ঞান শিক্ষা দেয়া, নদী ও কূপ খনন করা, খেজুর গাছ লাগানো, মসজিদ

---

১৪. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৭ : رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

১৫. আল-কুরআন, ১৬ : ১০-১৪ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ . يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

১৬. عن أنس بن مالك : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, বৈরূত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ১৯৮৭, খ. ৫, পৃ. ২২৩৯, হাদীস নং-৫৬৬৬; তাবারানী, *আল্-মুজামুল আওসাত*, আল-কাহেরা : দারুল হারামাইন, ১৪১৫, খ. ৯, পৃ. ১৪, হাদীস নং-৮৯৮৭

১৭. তাবারানী, *আল্-মুজামুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৮, হাদীস নং-৩৯৬৯ عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من يغرس غرسا كتب الله له من الأجر بقدر ما يخرج من ثمر ذلك الغراس.

নির্মাণ করা, বই-পুস্তক রেখে যাওয়া এবং এমন সন্তান দুনিয়ায় রেখে যাওয়া যে সন্তান ঐ ব্যক্তির ইন্তিকালের পর তার জন্য দুআ করবে।"[১৮] এভাবে কুরআন ও হাদীসে কৃষিকাজকে একটি উন্নত পেশা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

### ৩. শ্রম

সম্পদ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে শ্রম। কুরআন মাজীদেও এ মাধ্যমটির উল্লেখ করা হয়েছে। এটাকে অবলম্বন করে মানুষ কোন রকম পুঁজি ছাড়াই নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারে। কুরআনে দু'জন নবীকে শ্রমিক-মালিক হিসেবে পেশ করা হয়েছে। মূসা আ. মহরের বিনিময়ে তাঁর স্ত্রীর বকরী চরিয়েছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা শুআইব আ.-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন : "আমার একান্ত ইচ্ছা, আমার এই কন্যা দু'টির একটিকে বিবাহ দেব তোমার সাথে এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করে দেবে, আর যদি দশ বছর পুরো করে দাও, তবে সেটা হবে তোমার অনুগ্রহ।"[১৯]

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্নে কাছীর র. বলেন, মূসা বললেন : আমার ও আপনার মাঝে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, আট বছর ও দশ বছর এ দু'টির যে কোন একটি সময় আমি পূরণ করব। আর এটা আমার ইচ্ছাধীন। আট বছর পূরণ করার পর আমার উপর আপনি অতিরিক্ত পরিশ্রম চাপিয়ে দিতে পারবেন না।" আর আমাদের এ পারস্পরিক আলোচনায় আল্লাহ্কে আমরা সাক্ষী হিসেবে স্বীকার করছি। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহী। আমার পক্ষে আট বছরের স্থানে দশ বছর মজুরী করা যদিও মুবাহ, তা পূর্ণ করা জরুরী নয়।[২০]

### বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম

বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম বলতে ঐ সমস্ত পুঁজিহীন পেশাকে বোঝায়, যেগুলোর মধ্যে দেহের চেয়ে মস্তিষ্ক বেশি খাটানো হয়। পবিত্র কুরআনেও সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফ আ.-এর জীবনীতে বলা হয়েছে যে, মিসরের বাদশাহ্ তাঁর সাথে আলাপ-

---

১৮. عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سبعة يجري للعبد أجرهن و هو في قبره بعد موته من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ইমাম বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০, খ. ৩, পৃ. ২৪৮, হাদীস নং-৩৪৪৯

১৯. আল-কুরআন, ২৮ : ২৭ : قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ

২০. ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, তা.বি. খ. ৬ , পৃ. ২৩৩ ; আলূসী, *রূহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আজীম ওয়াস সাব'য়িল মাছানী*, তা.বি. খ. ১৫, পৃ. ১১৪।

আলোচনা করার পর তাঁকে চাকরিতে নিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ কর যা বলল তা আল্লাহ্ তাআলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন এভাবে আজ তুমি আমাদের দৃষ্টিতে বিশেষ মর্যাদাশীল ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে।"[২১]

তখন ইউসুফ আ. তাঁর প্রস্তাবিত চাকরিকে গ্রহণ করে নিজের সম্পর্কে যে কথা উপস্থাপন করেছিলেন তাহলো : "আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের কর্তা পদে নিযুক্ত করুন। আমি ঐগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও আছে।"[২২]

এ আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষ তার যোগ্যতা অনুযায়ী যে কোন চাকরির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারে। আর সে আবেদনের মধ্যে নিজের যোগ্যতার উল্লেখ করা বৈধ। কেননা ইউসুফ আ. এ সুযোগে নিজেকে রক্ষণাবেক্ষণকারী ও জ্ঞানী বলে দাবি করেছিলেন। শ্রম, চাকরি ও অন্যান্য পেশার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে নবী স. বলেন : "আল্লাহর প্রত্যেক নবীই বকরী চরিয়েছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : আপনিও? রসূলুল্লাহ স. বললেন : আমিও কয়েক কীরাত মজুরিতে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।"[২৩]

**৪.ব্যবসায়**

উপার্জনের জন্য ব্যবসায় একটি উত্তম পন্থা। আল-কুরআনেও ব্যবসায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "...এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে করেছেন হালাল।..."[২৪] উল্লেখ্য যে, ব্যবসাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। (এক) হালাল জিনিসের ব্যবসা (দুই) হারাম জিনিসের ব্যবসা।

**এক. হালাল বস্তুর ব্যবসা :** এ সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত আয়াতই যথেষ্ট। এ ছাড়া হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীকীন ও শহীদদের সাথে থাকবে।"[২৫]

---

২১. আল-কুরআন, ১২ : ৫৪ : فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

২২. আল-কুরআন, ১২ : ৫৫ : قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

২৩. রসূল স. বলেছেন : عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم قالوا ولا أنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط . - ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮৯, হাদীস নং-২১৪৩

২৪. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫ : .. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

২৫. রসূল স. বলেছেন : عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫১৫, হাদীস নং-১২০৯

**দুই. হারাম বস্তুর ব্যবসা :** হারাম বস্তুর ব্যবসা করা হারাম। যেমন :মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে আর অপবিত্র বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[২৬]

মদ এবং যে সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য যা পান বা সেবন করা হারাম তার উৎপাদন ও ব্যবসা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। এ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও তার ব্যবসালব্ধ আয় অবৈধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-দেবী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো অপবিত্র শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব তোমরা কি বিরত হবে না?"[২৭]

মদ এবং নেশা জাতীয় দ্রব্য ছাড়াও এ আয়াতে আরো যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাহলো : মূর্তি তৈরি, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবালব্ধ আয়, ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষির ব্যবসা। এ সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধের যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

**খ. অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন**

পৃথিবীতে দু'ধরনের উপার্জন পরিলক্ষিত হয়। একটি হলো বৈধ পন্থায় উপার্জন। আর অপরটি হলো অবৈধ পন্থায় উপার্জন। মানবজীবনে এ অবৈধ পন্থায় উপার্জনকে কুরআন ও হাদীসে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : "হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।"[২৮] রসূল স.

---

২৬. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৭...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

২৭. আল-কুরআন, ৫ : ৯০-৯১

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

২৮. আল-কুরআন, ৪ : ২৯ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

বলেছেন "এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধুলিধুসরিত দেহ নিয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে "হে প্রভু! হে প্রভু! বলে মুনাজাত করে, অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারাই সে পুষ্টি অর্জন করে। তার মুনাজাত কীভাবে কবুল হবে?"[২৯] সাদ রা. বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমার দুআ কবুল হয়। রসূল স. বললেন : হে সাদ! তোমার উপার্জনকে হালাল রাখ, তোমার দুআ কবুল হবে। মনে রেখ, কেউ যদি হারাম খাদ্যের একগ্রাসও মুখে নেয়, তাহলে চল্লিশ দিন যাবৎ তার দুআ কবুল হবে না।"[৩০]

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে : "যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে কোন কাপড় কিনলো এবং তার মধ্যে এক দিরহাম অসৎ উপায়ে অর্জিত, সে যতদিন ঐ কাপড় পরিহিত থাকবে ততদিন তার নামায কবুল হবে না।" ইমাম ইবনুল ওয়ারদ বলেন, তুমি যদি জিহাদের ময়দানে যোদ্ধা অথবা প্রহরী হিসেবে নিয়োজিত থাক, তাতেও কোন লাভ হবে না, যতক্ষণ তুমি যা খাচ্ছ তা হালাল না হারাম, তা বিবেচনায় না রাখ।"[৩১] অন্যত্র রসূল স. বলেন : "যে দেহ হারাম খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে তা জান্নাতে যাবে না।"[৩২]

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আবু বকর রা.-এর একজন গোলাম ছিল। সে আবু বকরকে মুক্তিপণ হিসাবে কিছু অর্থ নেয়ার শর্তে মুক্তি চাইলে তিনি তাতে সম্মত হন। অতপর সে প্রতিদিন তার মুক্তিপণের কিছু অংশ নিয়ে আসতো। আবু বকর রা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে এটা উপার্জন করে এনেছ? সে যদি সন্তোষজনক জবাব

---

২৯. পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত :

قَلَ رَسُولُ للّهِ صلى لله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ لرَّجُلَ يُطِيلُ لسَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى لسَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَلَمٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَلَمٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَلَمٌ وَغُذِىَ بِلْحَرَلَمِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, বৈরূত : দারুর যাইল, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ৮৫, হাদীস নং-২৩৯৩।

৩০. ইব্‌ন আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

قلم سعد بن لبي وقاص قال يارسول الله لدع الله لن يجعلني مستجاب لدعوة قال له لنبي صلى الله عليه و سلم يا سعد لطب مطعمك تكن مستجاب لدعوة ولذي نفس محمد بيده إن لعبد ليقذف للقمة لحرلم في جوفه ما يتقبل منه عمل لربعين يوما.

-তাবারানী, *আল্‌-মুজামুল আওসাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১০, হাদীস নং-৬৪৯৫

৩১. ইব্‌নে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

عن بن عمر قل : من لشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرلم لم يقبل الله له صلاة ما دلم عليه.

- আহমাদ, আবূ আব্দিল্লাহ, ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, মিশর : কর্ডোভা, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৯৮, হাদীস নং-৫৭৩২

৩২. *আত-তাবারানী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১১২, হাদীস নং-৫৯৬১।

দিত তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন, নচেত করতেন না। একদিন সে রাতের বেলায় তাঁর জন্য কিছু খাবার নিয়ে এলো। সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। তাই তাকে ঐ খাদ্যের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন এবং এক লোকমা খেয়ে নিলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খাবার তুমি কীভাবে সংগ্রহ করেছো? সে বললো, আমি জাহেলিয়াত যুগে লোকের ভাগ্য গণনা করতাম। আমি ভালো গণনা করতে পারতাম না। কেবল ধোঁকা দিতাম। এ খাদ্য সেই ভাগ্য গণনার উপার্জিত অর্থ দ্বারা সংগৃহীত। আবু বকর রা. বললেন ঃ কী সর্বনাশ! তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করেছো। তারপর গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বমিতে খাদ্য বের হবে না। উপস্থিত লোকেরা তাকে বললো, পানি না খেলে খাওয়া জিনিস বের হবে না। তখন তিনি পানি চাইলেন। পানি খেয়ে খেয়ে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য পেট থেকে বের করে দিলেন। লোকেরা বললো ঃ আল্লাহ্ আপনার ওপর দয়া করুন। ঐ এক লোকমা খাওয়ার কারণেই কি এত সব? আবু বকর রা. বললেন: খাদ্য বের করার জন্য যদি আমাকে মৃত্যুবরণও করতে হতো, তবুও আমি বের করে ছাড়তাম। কেননা আমি রসূলুল্লাহ স. কে শুনেছি : "যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে ওঠে তার জন্য জাহান্নামের আগুনই উত্তম।"[৩৩]

এখন মানবজীবনে সম্পদ উপার্জনের কতিপয় অবৈধ পন্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

### এক. সুদ

অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জনের বহুল প্রচলিত একটি প্রধান মাধ্যম হলো সুদের আদান প্রদান, যা আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনীতির শিরা উপশিরায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। সুদ অর্থনীতির সবচেয়ে পুরাতন ও জটিল একটি বিষয়। মিসর, রোম, গ্রীস ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে প্রাচীনকালে সুদ সম্পর্কে আইন রচনার প্রয়োজন হয়। বেদ, তাওরাত ও ইঞ্জিলে সুদকে একটি সমস্যা হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টেটলের মতো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এবং হিন্দু ও ইয়াহুদী সংস্কারকগণ সুদী কারবারের নিন্দা করেছেন। আর এটি ইসলামের সবচেয়ে ঘৃণ্যতম অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। সুদ অর্থনৈতিক শোষণ ও জুলুমের অন্যতম হাতিয়ার। এটি মানুষের মানসিকতাকে সংকীর্ণ করে দেয়, মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, অর্থনৈতিক গতিকে শ্লথ করে দেয়, অর্থবন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে। যদিও বিভিন্ন প্রাচ্যবিদ বিভিন্ন ধরনের যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত সুদকে বৈধ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

---

৩৩. *আত-তাবারানী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৯, হাদীস নং-২৭৩০; ইমাম হাকিম, *আল-মুসতাদরক 'আলাস্ সহীহাইন*, দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৪১, হাদীস নং-৭১৬২।

সুদের আরবী প্রতিশব্দ হলো 'রিবা' (ربا)। যার আভিধানিক অর্থ কয়েকটি হতে পারে। যেমন : বৃদ্ধি[৩৪], অতিরিক্ত[৩৫], বিকাশ[৩৬], সংখ্যাধিক্য ও ক্ষমতা[৩৭], ভূপৃষ্ঠ থেকে উঁচুস্থান[৩৮], শিশুর বেড়ে ওঠা[৩৯], ফুলে ওঠা[৪০] ইত্যাদি। সুদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো : Interest.[৪১]

---

৩৪. আয-যামাখশারী, *আসাসুল বালাগাত*, বৈরূত : মাতবাতুল আওলাদিল আওরিফান, ১৯৫২, পৃ. ১৫৩। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ "যে সুদ তোমরা দিয়েছ এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।" -আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ আল-কুরআন, ২ : ২৭৬

৩৫. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً "ফলে তিনি কঠোর হস্তে পাকড়াও করলেন।"-আল-কুরআন, ৬৯ : ১০। ইমাম আল-জাওহারী ও ফাররা র. আয়াতে বর্ণিত رَابِيَةً এর অর্থ করেছেন زائدة বা অতিরিক্ত বস্তু। যেমন যখন কেউ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি পায় তখন বলে : أربيت "আমি অতিরিক্ত পেয়েছি।"-আর-রাযী, *মুখতারুস সীহাহ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৪, পৃ. ২১৬

৩৬. ইবনে কাছীর, *তাফসীরু কুরআনিল আজীম*, বৈরূত : দারুল মারিফা, ১৯৮৭, খ. ৩, পৃ. ২১৬। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. "তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ ও বিকশিত হয়।"-আল-কুরআন, ২২ : ৫

৩৭. ইমাম শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, আল-কাহেরা : মাকতাবাহ ওয়া মাতবাআতি মুস্তাফাতুল বাবী আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহ, ১৯৬৪, খ. ৩, পৃ. ১৯১। এপ্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : ... أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ..."...যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান হয় ...।" আল-কুরআন, ১৬ : ৯২

৩৮. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব, ফিরুযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, আল-কাহেরা : মাতবাআতে আমীরিয়্যাহ, ১৪০২, খ. ৪, পৃ. ৩২৬। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন : وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ . "আর আমি মারইয়াম তনয় ও তাঁর মাকে এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম।" আল-কুরআন, ১৩ : ১৭

৩৯. ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার*, বৈরূত : মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৬৩, খ. ২, পৃ. ১৯২

৪০. ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব*, বৈরূত : দারু সাদির, তা.বি., খ. ১৪, পৃ. ৩০৪-৩০৫; ইমাম নববী, *তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, (বৈরূত : দারুর কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ১১৭

৪১. *Bangla Academy English-Bengali Dictionary*, Edetor, Zillur Rahman Siddiqui, Dhaka : Bangla Accademy, 2004, P. 406.

পরিভাষিক অর্থে- ঋণ গ্রহণ বাবদ ঋণের পরিমাণের হিসাবে যে অতিরিক্ত হিসাব নির্ণয় করা হয় তাকে সুদ বলে। আর এ অতিরিক্ত অর্থ ভোগকারীকে সুদখোর বলে।[৪২]

"সুদ বা রিবা হচ্ছে সেই বাড়তি অর্থ যার বিনিময়ে ঋণদাতা ঋণ পরিশোধের সময়টা আরো কিছু দিনের জন্য বাড়িয়ে দেয়।"[৪৩]

ইবনুল আরাবী র. বলেন : "রিবা তথা সুদ হচ্ছে সে বাড়তি দাম, যা কোন মালের বিনিময় নয়।"[৪৪]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. বলেন : "পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া মালের প্রবৃদ্ধিই সুদ বা রিবা।"[৪৫]

আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী র. বলেন : "পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই রিবা বা সুদ।"[৪৬]

সুদ যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনে হারাম। তাছাড়া সুদ সর্বযুগে এবং সবসময় ঘৃণিত অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে, যা আমরা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও সভ্যতার দিকে দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট জানতে পারি। যেমন : ইয়াহুদী ধর্মে সুদকে হারাম করা হয়,[৪৭] যা আল-কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায়।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিও আল্লাহ্ একই বিধান দিয়েছিলেন যেমনটি দিয়েছিলেন ইয়াহুদীদের প্রতি। এ প্রসঙ্গে ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে : "যাহারা তোমাদের মঙ্গল করে, তোমরা যদি তাহাদেরই মঙ্গল করিতে থাক, তবে তাহাতে প্রশংসার কি আছে? খারাপ লোকেরাও তো তাহা করিয়া থাকে। যাহাদের নিকট হইতে তোমরা ফিরিয়া পাইবার আশা কর, যদি তাহাদেরই টাকা ধার দাও তবে তাহাতে প্রশংসার কি আছে? ফিরিয়া পাইবে বলিয়াই তো খারাপ লোকেরা খারাপ লোকদের ধার দিয়া থাকে। কিন্তু তোমরা তোমাদের শত্রুদের মহব্বত করিও এবং তাহাদের মঙ্গল করিও। কিছুই ফিরিয়া পাইবার আশা না রাখিয়া ধার দিও। তাহা হইলে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে।"[৪৮]

---

৪২. *বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ১১৫৭।

৪৩. আলী নাৱিফ, *আশ-শুহূদ আল-মুফাস্সাল ফী আহকামির রিবা*, মিশর : দারুত তাকওয়া, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৪; আবূ জাফর আত-তাবারী, *জামি'উল বয়ান ফী তা'বীলির কুরআন*, খ. ৩, পৃ. ৫৯৫

৪৪. আবূ বকর আর-রাযী, *আহকামুল কুরআন*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ১৫৩

৪৫. ইমাম বদরুদ্দীন আইনী, *উমদাতুল কারী শারহি সহীহুল বুখারী*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৭৯, খ. ১২, পৃ. ১৯৯

৪৬. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, আল-কাহেরা : দারুল মা'আরিফ, ১৯৫২, খ. ৪, পৃ. ২৫

৪৭. সিফরুল খুরুজের ২২ তম অধ্যায়ের ২৪ তম স্তবক; সিফরুল আহবারের ২৫ তম অধ্যায়ের ৩৫ তম স্তবক; সিফর তাছনীয়ার ২৩ তম অধ্যায়ের ১৯ তম স্তবক; সিফরুর আমছালের ২৮ তম অধ্যায়ের ৮ম স্তবক। ড. মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আবূ সাহেবাহ, *হুলূল লি মুশকিলাতুর রিবা*, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, তা.বি., পৃ. ২৬৪

৪৮. *ইঞ্জিল শরীফ* : বাংলা অনুবাদ, ঢাকা : বিবিএস, ১৯৮০, অধ্যায়-৬, শ্লোক-৩৩-৩৫

শুআইব আ. এর উম্মত আইকা[৪৯] সম্প্রদায়ের জন্যও সুদ হারাম ছিল।[৫০]
গ্রিক সভ্যতার মত রোমান সভ্যতায়ও সুদকে প্রকৃতি বিরোধী উপার্জন ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।[৫১]

জাহেলী যুগে ও আরব কুরাইশরা সুদকে সম্পদ অর্জনের অনিষ্টকর পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করতো। দেখা যায় রসূল স.-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর আগে যখন কাবা সংস্কার করা হচ্ছিল তখন আবূ ওয়াহাব সকলকে এ কাজে সুদের অর্থ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিল।[৫২]

জাহিলী যুগে কাফির, ইয়াহুদী এবং মুশরিকরা সুদকে ব্যবসা মনে করতো, অথচ ব্যবসা ও সুদ এক জিনিস নয়, যা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ৭টি আয়াতের মাধ্যমে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের মন্দ পরিণতি, হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা, ভ্রষ্টতা ও কঠোর শাস্তির বাণী শুনিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "যারা সুদ খায়, তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলে, নিশ্চয় ব্যবসা তো সুদেরই অনুরূপ, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম। অতএব যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ এসেছে, অনন্তর সে বিরত রয়েছে তবে যা অতীত হয়েছে তা তারই এবং তার কৃতকর্ম আল্লাহর প্রতি নির্ভর। আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করতে, তারা দোযখবাসী হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে"।[৫৩]

---

৪৯. আল-কুরআনে শুআইব আ. এর সম্প্রদায়কে 'আসহাবুল আইকা' (أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। আব্দুল ওহহাব নাজ্জার, *কাসাসুল কুরআন*, পৃ. ১৮৬; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফীত তারীখ*, তা.বি. খ. ১, পৃ. ৮৮৮; ইবনে কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১, পৃ. ২২৬; মুহাম্মদ জামীল আহমাদ, *আম্বিয়ায়ে কুরআন*, খ. ২ , পৃ. ৬২; সাবূনী, *আন-নবুওয়াতুল আম্বিয়া*, পৃ. ২৮২; ইব্‌ন 'আসাকির, *তাহযীব তারীখে দিমাশ্‌ক*, খ. ৬ ,পৃ. ৩১৯

৫০. আল-কুরআন, ১১ : ৮৭ :
قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ.

৫১. *ইনসাইক্লোপিডিয়া অব আমেরিকানা*, ইন্টারন্যাশনাল সংস্করণ, নিউইয়ার্ক : ইউ এস ইউ আর ওআই, ১৯৭৭, খ. ২৭, পৃ. ১৭৯

৫২. ইবেন হিশাম, *আস-সীরাতুন্নাববীয়্যাহ*, আল-কাহেরা : মাকতাবাতুল কুল্লীয়্যাতুল আযহারিয়্যাহ, ১৯৭৪, খ. ১, পৃ. ১৭৯

৫৩. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫ : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অন্য এক আয়াতে সুদ ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ আল্লাহ্ তাআলা বলেন : 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভক্ষণ করো না, আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। আর ভয় কর ঐ আগুনের যা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে"।[৫৪]

সুদ খাওয়া আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর। পবিত্র কুরআনে মোট ৭টি আয়াত, আর ৪০টিরও অধিক হাদীস এবং ইজমা দ্বারা সুদ হারাম প্রমাণিত। সুদের অবৈধতা এবং সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো -

আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: "তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বিরত থাক। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! সাতটি বিষয় কী কী? তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধ হতে পলায়ন করা এবং সতী-সাধবী মুমিন স্ত্রীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করা"।[৫৫]

রসূল স. বলেছেন : "কোন সমাজে সুদের প্রচলন হলে সেখানে মানসিক রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাবে, ব্যভিচারের প্রচলন হলে মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে এবং মাপে কম দেয়ার প্রথা চালু হলে আল্লাহ সেখানে বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন। এটা অবধারিত।"[৫৬]
রসূল স. বলেছেন : "সুদের ৭০টি গুনাহ। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো আপন মাকে বিয়ে করার গুনাহর সমান। আর সবচেয়ে জঘন্য সুদ হলো, সুদের পাওনা আদায় করতে গিয়ে কোন মুসলমানের সম্ভ্রম নষ্ট করা বা তার সম্পত্তি জবর দখল

---

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

৫৪. আল-কুরআন, ২ : ২৭৯ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ .

৫৫. আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .

ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, খ. ৯, পৃ. ৩১৫, হাদীস নং-২৫৬ ; ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ২৪৪ ; হাদীস নং-১২৯ ; ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৮, পৃ. ৬৮, হাদীস নং-২৪৯০।

৫৬. ما ظهر في قوم الربا إلا ظهر فيهم الجنون و لا ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت و ما بخس قوم الكيل و الوزن إلا منعهم الله القطر ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৪

করা"।[৫৭] রসূল স. বলেছেন ঃ "কোন সুদখোর যদি এক দিরহাম পরিমাণও সুদ আদায় করে তবে তার গুনাহ্ ৩৬ বার ব্যভিচার করার সমান।"[৫৮]
রসূল স. আরো বলেছেন : "আল্লাহ্ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক সকলেরই ওপরই অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।"[৫৯]

ইসলামে সুদ ও সুদী কারবার নিষিদ্ধ। যদি কেউ এ গর্হিত কাজ করে তবে তার অপরাধের মাত্রানুযায়ী মুসলিম শাসক সুদের অর্থ ফেরত নেয়া, আর্থিক জরিমানা, আটকাদেশ, বেত্রাঘাত, নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ড এমনকি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাও করতে পারেন। ইমাম আল-জাস্সাস র. বলেন : সুদের মাধ্যমে যেহেতু মানুষের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করা হয়, সেহেতু তার শাস্তি ছিনতাইকারীর শাস্তির মত হবে।[৬০]

### দুই. সম্পদ আত্মসাৎ ও ঘুষ

সম্পদ আত্মসাৎ ও ঘুষ গ্রহণ করা বা কাউকে ঘুষ দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করো না, শাসকদের কাছে অর্থ নিয়ে যেও না, যাতে তোমরা মানুষের অর্থের একাংশ অন্যায় পন্থায় ভোগ করতে পার, অথচ তোমরা জান।"[৬১] অর্থাৎ তোমরা শাসকদের উৎকোচ দিয়ে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা করো না অথচ তোমরা তো জান যে, এ রকম করা বৈধ নয়।

---

৫৭. الربا سبعون بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه و لن أربي الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم فصح أنه باب من أعظم أبواب الربا ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪৫, পৃ. ৫২৩, হাদীস নং-২৭৫৩৬

৫৮. عن لنس بن مالك قل : خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فنكر لربا و عظم شأنه فقال :
لن لرجل يصيب من لربا أعظم عند الله في لخطيئة من ست و ثلاثين زنية يزنيها لرجل و
لن أربى لربا عرض لرجل لمسلم تفرد به أبو مجاهد عبد الله بن كيسان لمروزي عن ثابت
ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৯৫, হাদীস নং-৫৫২৩

৫৯. عن ثوبان رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لعن الله الراشي و
المرتشي و الرائش الذي يمشي بينهما
ইমাম হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন*, তা. বি. খ. ৪, পৃ ১১৫, আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৭, পৃ. ৮৫, হাদীস নং-২২৩৯৯

৬০. আবূ বকর আল-জাস্সাস, *আহকামুল কুরআন*, আল-কাহরো : আল-মাতবাআতুল বাহিয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯২৮, খ. ১, পৃ. ৪৬৫

৬১. আল-কুরআন, ২: ১৮৮
وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

রসূল স. বলেছেন : আল্লাহ ঘুষদাতা ও ঘুষখোর উভয়কে অভিশম্পাত দিয়েছেন"।[৬২] রসূল স. আরো বলেছেন : "যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করলো, অতঃপর যার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে, সে তাকে কোন হাদিয়া বা উপহার দিল, সে যদি এই হাদিয়া গ্রহণ করে, তবে তা হবে একটি বড় ধরনের সুদ খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত"।[৬৩] ইবনে মাসউদ রা. বলেন : "তোমার ভাই-এর প্রয়োজন পূরণ করে দিয়ে তার কাছ থেকে যদি উপহার গ্রহণ করো তবে তা হবে হারাম।"[৬৪]

যে ব্যক্তি কোন কাজের জন্য বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়, সে যদি তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ করে দিয়ে যার জন্য কাজ করেছে তার কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করে, তবে সেটা সর্বসম্মতভাবে ঘুষ বিবেচিত হবে, তা উপহার, উপঢৌকন, হাদিয়া বা বখশিশ যে নামেই প্রদত্ত হোক না কেন। আর যদি দায়িত্বের অতিরিক্ত হয় এবং চাকুরীর সময়ের বাইরে করা হয় তবে সে জন্য পারিশ্রমিক নিলে তা ঘুষ হবে না।

**তিন. জুয়া**

জুয়াকে ইসলাম অবৈধ উপার্জন হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু ভাগ্যগণনা শয়তানের কাজ। সুতরাং এসব থেকে দূরে থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[৬৫]

যে কোন ধরনের জুয়াই এ আয়াতের ঘোষণার মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা দাবা, তাস, পাশা, গুটি অথবা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা খেলা হোক। এটা আসলে অবৈধ পন্থায় মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ ও লুণ্ঠন করার আওতাভুক্ত। রসূল স. বলেছেন : "কেউ যদি এরূপ প্রস্তাব দেয় যে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলবো, তবে তার সদকা করা উচিত।"[৬৬]

---

৬২. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لعن الله الراشي و المرتشي في الحكم

৬৩. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرا من أبواب الربا ইমাম হায়ছামী, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, আয-ঝাওয়াযিরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৭৯

৬৪. عن ابن مسعود قال : السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدى إليك هدية فتقبلها منه

৬৫. আল-কুরআন, ৫ : ৯০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৬৬. আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال

জুয়া সম্বন্ধে শুধু কথা বললেই যদি সাদকা বা কাফ্ফারা দিতে হয়, তবে কাজ করলে কী পরিণতি হতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। তাস ও দাবা ইত্যাদি খেলা যদি আর্থিক হারজিত থেকে মুক্ত হয় এবং নিছক চিত্তবিনোদনমূলক হয়, তবে তাও বৈধ হওয়ার বিষয় নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে হারাম, কারো মতে হালাল। কিন্তু আর্থিক হারজিত যুক্ত থাকলে তা যে হারাম, সে ব্যাপারে সকল মাযহাবের ইমামগণ একমত। পাশা জাতীয় জুয়া খেলা হারাম হওয়া সম্পর্কে ইমামগণ একমত হয়েছেন। কারণ রসূল স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে যেন নিজের হাতকে শূকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে রঙিন করলো।"[৬৭] ইবনে উমর রা. বলেন ঃ "পাশা খেলা এক ধরনের জুয়া এবং তা শূকরের চর্বি দিয়ে পালিশ করার মতো হারাম কাজ।"[৬৮]

দাবা খেলা তো অধিকাংশ আলিমের মতে হারাম, তাতে কোন কিছু বন্ধক রাখা তথা আর্থিক হারজিতের বাধ্যবাধকতা থাক বা না থাক। তবে বন্ধক রাখা এবং হেরে যাওয়া খেলোয়াড়ের বন্ধক বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা, অন্য কথায় আর্থিক হারজিত যুক্ত থাকলে তা সর্বসম্মতভাবে জুয়া ও হারাম। বন্ধক রাখা ও আর্থিক হারজিত যুক্ত না থাকলেও অধিকাংশ আলিমের মতে দাবা খেলা হারাম। কেবল ইমাম শাফেঈ একে হালাল মনে করেন শুধু এ শর্তে যে, তা ঘরোয়াভাবে খেলা হবে এবং নামায কাযা অথবা অন্য কোন ফরয ওয়াজিব বিনষ্ট হওয়ার কারণ হবে না। ইমাম নববী ইমাম শাফেঈর এই মতানুসারে ফতোয়া দিতেন। সেই সাথে তিনি পারিশ্রমিক বা পুরস্কারের বিনিময়ে দাবা খেলাকে জুয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে রায় দেন।

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী ও ওয়াকী ইবনুল জাররাহ ব্যাখ্যা দেন যে, 'আযলাম' অর্থ দাবা খেলা। আলী রা. বলেন : "দাবা হলো অনারবদের জুয়া। আলী রা. একদিন দাবা খেলায় রত একদল লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : "তোমরা যা নিয়ে এরূপ ধ্যানে মগ্ন আছ তা কী? এগুলো স্পর্শ করার চেয়ে জ্বলন্ত

---

أقامرك فليتصدق . ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৬৪, হাদীস নং-৫৭৫৬; ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮১, হাদীস নং-৪৩৪৯

৬৭. عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله . -ইবনে হিব্বান, *আস্-সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১৮১, হাদীস নং-৫৮৭২; ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ২৮৭, হাদীস নং-১৯৫২১; ইবনে মাজাহ, *আস্-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৩৮, হাদীস নং-৩৭৬২

৬৮. عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله . ইবনে হিব্বান, *আস্-সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ১৮১, হাদীস নং-৫৮৭২; ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩২, পৃ. ২৮৭, হাদীস নং-১৯৫২১; ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস্-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৩৮, হাদীস নং-৩৭৬২

আগুন স্পর্শ করাও ভালো। আল্লাহর কসম, তোমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আলী রা. আরো বলেন ঃ "দাবাড়ুর ন্যায় মিথ্যাবাদী আর কেউ নেই। সে বলে আমি হত্যা করছি, অথচ সে হত্যা করেনি। সে বলে, ওটা মরেছে, অথচ কোন কিছুই মরেনি।"[৬৯]

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াহকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, দাবা খেলার ব্যাপারে আপনার কি আপত্তি আছে? তিনি বললেন ঃ দাবা পুরোপুরি আপত্তিকর। মুহাম্মদ ইবনে কাব আল-কারযী দাবা খেলা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ দাবা খেলার ন্যূনতম ক্ষতি এই যে, দাবাড়ু কিয়ামতের দিন বাতিলপন্থীদের সাথে একত্র হবে।[৭০]

রসূল স. বলেন : "আল্লাহ প্রতিদিন তাঁর সৃষ্টির প্রতি ৩৬০ (তিনশো ষাট) বার রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যে দাবা খেলে, সে এর একটি দৃষ্টিও পায় না।"[৭১]

**রাষ্ট্রীয় আইনে জুয়া খেলা নিষিদ্ধ এ প্রসঙ্গে প্রকাশ্য জুয়া আইন ১৯৬৭ ধারায় বলা হয়েছে—**
এ আইন প্রকাশ্য জুয়া আইন-১৮৬৭ নামে অভিহিত হইবে এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

১. জুয়া খেলা শব্দ দ্বারা জুয়া বা বাজী ধরা বুঝাইবে (কেবল ঘোড়া দৌড়ের উপর বাজী ধরা ছাড়া) যখন উক্ত জুয়া বাজী অনুষ্ঠিত হয়-

ক. অনুরূপ ঘোড়া দৌড়ের দিনে,

খ. এমন স্থানে যা সরকারি অনুমোদন লইয়া স্টুয়ার্ডরা ঘোড়া দৌড়ের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়াছে এবং

গ. কটি লাইসেন্সযুক্ত বুক মেকারসহ; অথবা

---

৬৯. ইমাম আয-যাহাভী, *আল-কাবায়ির*, বৈরূত : দারুন নাদওয়াতুল জাদীদাহ, তা. বি., পৃ. ৮৮
قال سفيان و وكيع بن الجراح : هي الشطرنج و قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الشطرنج ميس الأعاجم و مر رضي الله عنه على قوم يلعبون بها فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفى خير له من أن يمسها ثم قال : و الله لغير هذا خلقتم و قال أيضا رضي الله عنه : صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدهم : قتلت و ما قتل و مات و ما مات.

৭০. প্রাগুক্ত,

৭১. ওয়াসিল রা. হতে বর্ণিত :
عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله في كل يوم ثلثمائة رضي الله عنه ستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاه فيها نصيب — يعني لا عب الشطرنج لأنه يقول شاه مات.

২. ১৯২২ সালের বঙ্গীয় প্রমোদ কর আইনের ১৪ ধারার সংজ্ঞানুসারে টোটালাইজেটরের দ্বারা কিন্তু লটারী উহার অন্তর্ভুক্ত নহে; খেলার কাজে ব্যবহৃত যে কোন হাতিয়ার বা সামগ্রী "ক্রীড়া সামগ্রী" শব্দের অন্তর্গত, এবং "সাধারণ ক্রীড়া ভবন" অর্থ যে কোন ঘর, কক্ষ, তাঁবু বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান বা প্রাঙ্গণ বা গাড়ি অথবা যে কোন স্থানে যেখানে মালিকের রক্ষকের বা ব্যবহারকারীর মুনাফা বা উপার্জনের জন্য যে কোন ক্রীড়াসামগ্রী বা অন্য কিছু ভাড়া বা অর্থের বিনিময়ে রাখা বা ব্যবহৃত হয়।

৩. দণ্ড

এই আইনের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় যে কোন ব্যক্তি যে কোন ঘর, তাঁবু, কক্ষ, প্রাঙ্গণ বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মালিক বা রক্ষণাবেক্ষণকারীর ব্যবহারকারী হিসেবে অনুরূপ স্থানকে সাধারণ জুয়ার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত করিতে দিলে; এবং উপরোক্ত ঘর, তাঁবু, কক্ষ, প্রাঙ্গণ, বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মালিক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবহারকারী হিসেবে যে কোন ব্যক্তির জ্ঞাতসারে বা স্বেচ্ছায় অন্য লোককে, উক্ত স্থানকে সাধারণ জুয়ার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত করিতে দিলে; এবং যে কেহ উপরে বর্ণিত স্থানকে উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কাজে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করিলে অথবা যে কোন ভাবে সাহায্য-সহায়তা করিলে; এবং

অনুরূপ গৃহের, তাঁবুতে, কক্ষে, প্রাঙ্গণে বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে যে কেহ জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান বা নিয়োজিত করিলে অভিযুক্ত হইয়া যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারে সোপর্দ হইবে এবং অনূর্ধ্ব দুইশত টাকা পর্যন্ত জরিমানায় এবং পেনাল কোডের সংজ্ঞানুসারে অনূর্ধ্ব তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

## চার. চাদাবাঁজি

চাদাবাঁজি করে সম্পদ উপার্জন করা ও এক ধরনের জুলুম এবং ইসলামী শরীয়তে এ জাতীয় উপার্জনকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে : "কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।"[৭২]

যারা জোর করে চাঁদা আদায় করে তারা নিজেরাও জুলুমবাজ এবং তারা জুলুমবাজদের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারীও। চাঁদাবাজরা যে চাঁদা আদায় করে, তা যেমন তাদের প্রাপ্য নয়, তেমনি যে পথে তা ব্যয় করে তাও বৈধ পথ নয়। জোরপূর্বক চাঁদা আদায়কারী আল্লাহর বান্দাদের ওপর জুলুম ও শোষণ চালায়। তাদের কষ্টার্জিত অর্থ কেড়ে নেয়। এ ধরনের লোকেরা কিয়ামতের দিন মজলুমদের

---

৭২. আল-কুরআন, ৪২ : ৪২

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

প্রাপ্য দিতে পারবে না। যদি তাদের কবুলকৃত কোন সৎকর্ম থাকে, তবে তাই দিতে হবে। অন্যথায় মজলুমদের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। রসূল স. বলেছেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন প্রচুর নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত নিয়ে আসবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়ে আসবে, প্রহার করে আসবে অথবা কারো সম্পদ আত্মসাৎ করে আসবে। এরপর এই সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের একে একে তার পুণ্যকর্ম দিয়ে দেয়া হবে। যখন পুণ্যকর্ম ফুরিয়ে যাবে, তখন মজলুমদের পাপ কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ জন্য রসূল স. বলেছেন : "অবৈধ চাঁদা আদায়কারী জান্নাতে যাবে না।"[৭৩]

এ থেকে বুঝা যায়, এটি কত বড় গুনাহের কাজ। জোরপূর্বক অর্থ আদায় করার কাজটি ডাকাতি ও রাহাজানির নামান্তর। জোরপূর্বক চাঁদা যে আদায় করে, যে তার সহযোগিতা করে, যে লেখে, যে সাক্ষী থাকে, তারা সবাই এ পাপের সমান অংশীদার। তারা সবাই আত্মসাৎকারী ও হারামখোর। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, জাবির রা. রসূল স. কে বললেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমার মাদক ব্যবসায় ছিল। সেই ব্যবসায় থেকে আমার বেশ কিছু সঞ্চিত নগদ অর্থ আছে। আমি যদি তা দিয়ে আল্লাহর কোন ইবাদত বা সাওয়াবের কাজ করি, তবে তাতে কি আমার উপকার হবে? রসূল স. বললেন : তুমি যদি সেই অর্থ হজ্জ, জিহাদ, অথবা সাদকায় ব্যবহার করো, তবে তা আল্লাহর কাছে একটা মাছির ডানার সমানও মূল্য পাবে না। আল্লাহ পাক পবিত্র সম্পদ ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না।"[৭৪]

## পাঁচ. চুরি

প্রচলিত ও ইসলামী আইনে চুরি একটি জঘণ্য অপরাধ। যার শাস্তিও ভয়াবহ। চুরির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ভোগ করা হারাম ও দণ্ডনীয় অপরাধ।

চুরি শব্দের অর্থ-অপহরণ, চৌর্য, পরের দ্রব্য না বলে গ্রহণ, গোপনে আত্মসাৎকরণ ও অন্যের অলক্ষ্যে চুরি করা, সম্পদ কুক্ষীগত করা ইত্যাদি।[৭৫] চুরির আরবী প্রতিশব্দ হলো আস-সারাকাহ (السرقة)। এর আভিধানিক অর্থ-অপরের সম্পদ গোপনে হস্তগত করা।[৭৬] গোপনীয়ভাবে অন্যের নিকট হতে সম্পদ বা অন্য কিছু নিয়ে নেয়া।

---

৭৩. উকবা রা. হতে বর্ণিত :

عن عقبة بن عامر قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا يدخل الجنة صاحب مكس.

ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর,* মওসূল : মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হুকম, ১৯৮৩, খ. ১৭, পৃ. ৩১৭, হাদীস নং-৮৭৮

৭৪. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫২।

৭৫. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

৭৬. মাওলানা উবায়দুর হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০০, খ.৫, পৃ. ৩১৭

কোন বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক অপরের দখলভুক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষিত স্থান হতে গোপনে হস্তগত করাকে চুরি বলে।[৭৭]
আব্দুল কাদির আওদা বলেন : "চুরি হচ্ছে গোপনে অন্যের সম্পদ নেয়া অর্থাৎ গোপন পন্থায় অথবা প্রাধান্য বিস্তার করে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা"।[৭৮]

লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে- গোপনভাবে অপরের সম্পদ হরণ করাকে চুরি বলে।[৭৯]
তাহ্যীবুল লুগাত গ্রন্থে বলা হয়েছে : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বালেগ ও বিবেকবান ব্যক্তি কর্তৃক দশ দিরহাম পরিমাণ সম্পদ হরণ করাকে চুরি বলে।[৮০]

মোটকথা, কোন জ্ঞানবান বালেগ ব্যক্তি কর্তৃক অপরের মালিকানাধীন সংরক্ষিত নিসাব (এক দিনার বা দশ দিরহাম) পরিমাণ সম্পদের মূল্য, যার মাঝে চোরের কোন অধিকার কিংবা অধিকারের কোন অবকাশনেই। গোপনে ও ধরা পড়ার ভয়ে সবার অলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হস্তগত করাকে চুরি বলে। সে ব্যক্তি মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক অথবা মুরতাদ হোক অথবা পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক, স্বাধীন হোক কিংবা দাস হোক এতে কোন পার্থক্য হবে না। সবার বেলায় একই বিধান প্রযোজ্য।[৮১]

জাস্টিনিয়ানের বিধিবদ্ধ আইন এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী কাউকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে তার সম্পত্তি ব্যবহার বা দখল করা অথবা অন্যের সম্পত্তি অবৈধভাবে আত্মসাত করার নাম চুরি।[৮২]
অপর এক বর্ণনায় এসেছে, অপহরণ করার উদ্দেশ্যে অন্যের অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাত বা ব্যবহার করলে তা চুরি বলে বিবেচিত হয়। আর চুরির দায়ে শুধু চোর নয়, চোরের সহায়তাকারী এবং পরামর্শদানকারীও অভিযুক্ত হতো।[৮৩]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন : "হে নবী! মুমিন নারীগণ যখন তোমার নিকট এসে বায়আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সহিত কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না........ তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করিও।"[৮৪]

---

৭৭. গাজী শামছুর রহামন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১, ১. খ, ১ম ভাগ, পৃ. ৫৩

৭৮. আব্দুল কাদির আওদাহ, প্রাগুক্ত, ২য় খ. পৃ. ৫১৪ السرقة هي أخذ مال الغير خفية أي سبيل الاستخفاء أو أخذ مال الغير على سبيل المغالبة

৭৯. ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩২

৮০. তাহজীবুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭

৮১. *ফাতওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, ৫ খ. পৃ. ৩১৭

৮২. নির্মলেন্দু ধর, *রোমান আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

৮৩. প্রাগুক্ত,

৮৪. আল-কুরআন, ৬০ :১২

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ........ فَبَايِعْهُنَّ

আল-কুরআনে চুরির শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন : "আর পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও এতো তাদের কৃতকর্মের ফল এবং এদণ্ড আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৮৫] উল্লেখ্য যে, ইমাম চতুষ্ঠয়ের মতে, হাত কব্জি থেকে কেটে দিতে হবে।[৮৬]

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমবার চুরির দায়ে ডান হাত, দ্বিতীয়বার চুরির দায়ে বাম পা কেটে দিতে হবে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[৮৭]

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৯ নং ধারা অনুযায়ী সাধারণ চুরির শাস্তি হলো তিন বছর কারাদণ্ড অথবা অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৮৮] আর বাসাবাড়ি থেকে চুরি করলে শাস্তি হলো সাত বছর কারাদণ্ড অথবা অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে[৮৯]

রোমান আইনে আগে চুরিকে একটি দেওয়ানী ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা হতো; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এটিকে ফৌজদারি ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ধরা হয়। কাজেই চুরির বিরুদ্ধে দ্বিবিধ প্রতিকার ছিল নিম্নরূপ :

১. চুরির ধরন যাই হোক চোরাই মাল ফেরৎ দেয়া হচ্ছে চুরির প্রতিকারের প্রাথমিক ব্যবস্থা।

২. চুরির ক্ষেত্রে শাস্তি জরিমানা। ক. হাতে নাতে ধরা পড়া চুরির ক্ষেত্রে চোরাই মালের মূল্যের চারগুণ এবং পরে ধরা পড়া চুরির ক্ষতিপূরণ চোরাই মালের মূল্যের দ্বিগুণ।[৯০]

## ছয়. ডাকাতি

ডাকাতি বড় ধরনের অপরাধ। ডাকাতি চুরির চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ। পরকালীন শাস্তি ছাড়াও এ অপরাধের জন্য ইসলাম পার্থিব দণ্ডবিধি দিয়েছে। মানব জীবনে অর্থ-সম্পদ থাকা অপরিহার্য। ইসলাম এ ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় ভোগের জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধান

---

৮৫. আল-কুরআন, ৫ : ৩৮ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৮৬. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন কাসেমী, *মুহাসিত তাবীল*, মিসর : দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ১৯৭৬।

৮৭. আর-রাজী আল-মালিক, *আল-মুনতাকা*, বৈরূত : দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৪০৪, খ. ৭, পৃ. ১৬৭; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন কাসেমী, *মুহাসিনুত তা'বীল*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৯৭৬। তৃতীয়বার চুরি করলে তার শাস্তি কী হবে এ বিষয়ে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয় যা এ স্বল্প পরিসরে আলোচনার সুযোগ নেই। তাই উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য উল্লেখিত গ্রন্থগুলো দেখা যেতে পারে। আর-রাজী আল মালিক, *আল-মুনতাকা*, বৈরূত : দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৪০৪, খ. ৭, পৃ. ১৬৭

৮৮. গাজী শামছুর, রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, ধারা-৩৭৯।

৮৯. প্রাগুক্ত, ধারা-৩৮২।

৯০. নির্মলেন্দু ধর, *রোমান আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

পেশ করেছে। হালাল পথে উপার্জিত ধন-সম্পদকে হালাল ঘোষণা করেছে আর হারাম পথে অন্যায় ও জুলুমের মাধ্যমে আহরিত ধন-সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে এবং পরকালে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার ভয় দেখিয়েছে।

ডাকাত শব্দের অর্থ দস্যু, লুণ্ঠনকারী, বলপূর্বক অপহরণকারী, অসম সাহসী ও নির্ভীক এবং ডাকাতি শব্দের অর্থ হল : দস্যুবৃত্তি, দস্যু দ্বারা লুণ্ঠন, অসম সাহসিক ও বিস্ময়কর দুষ্কর্ম ইত্যাদি।[৯১]

যে সব লোক সশস্ত্র হয়ে পথে-ঘাটে, ঘরে-বাড়িতে, নদীতে-মরুভূমিতে নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালায় এবং প্রকাশ্যভাবে জনগণের সম্মুখে জনগণের ধন-মাল হরণ করে নিয়ে যায়, তাদেরকেই বলা হয়েছে ডাকাত, লুণ্ঠনকারী বা মুহারিবুন।[৯২]

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ভাষ্যে বলা হয়েছে, "যদি চুরি করিবার উদ্দেশ্যে বা চুরি করিতে কিংবা চুরিতে লব্ধ সম্পত্তি বহন বা বহনের উদ্যোগকালে অপরাধকারী তদুদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় বা আঘাত করে কিংবা আটক করে ভীতি প্রদর্শন করে তাহলে উক্ত চুরিকে দস্যুতা বলে।"[৯৩]

আর সেই ক্ষেত্রে ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোন দস্যুতা অনুষ্ঠান করে বা করিবার উদ্যোগ করে তাহা হইলে তাকে ডাকাতি বলে।[৯৪]

যারা ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ ছিনিয়ে নেয় এবং ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষের জীবন ও সম্ভ্রমহানী ঘটায় তাদের ক্ষেত্রে আল-কুরআনে সরাসরি শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।"[৯৫]

---

৯১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬

৯২. *আল মুগনি লি শারহিল কাবির*, তা.বি. খ. ১০, পৃ. ৩০৩

৯৩. গাজী শামছুর, রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, ধারা-৩৯০

৯৪. প্রাগুক্ত, ধারা-৩৯১

৯৫. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ডাকাতি প্রতিরোধে মুমিনদের এগিয়ে আসতে হবে। কোথাও ডাকাতির ঘটনা ঘটলে মুমিন নির্বিকার থাকতে পারে না। কেননা এটা ঈমানের পরিপন্থী আচরণ। এ প্রসঙ্গে নবী স. বলেছেন : "যখন কোনো লোক কোন মূল্যবান জিনিস ছিনিয়ে নেয় আর লোকেরা তা চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে তখন সে আর মুমিন থাকে না"।[৯৬]

অতএব ডাকাতি সুস্থ সমাজব্যবস্থার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এ কারণে ইসলামী আইনে ডাকাতি জঘন্যঅপরাধ। ইসলামী সমাজে ডাকাতির কোন সুযোগ থাকতে পারে না। ডাকাতির পথ ও কারণ সর্বতোভাবে বন্ধ করা একান্তই আবশ্যক।

ইসলামী বিধান মতে ডাকাতির শাস্তি অপরাধভেদে কমবেশী হতে পারে। শাস্তির বিধান প্রয়োগ করার ব্যাপারে ইসলামী সরকারের স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থাৎ বিচারক ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারবে, শূলে চড়াতে পারবে এবং বহিষ্কার করতে পারবে। এই মতটি ইবনে আব্বাস, হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব ও মুজাহিদের। যে ডাকাত হত্যা ও সম্পদ হরণ এই দুই অপরাধই করে তাকে হত্যা করা হবে অতঃপর শূলে চড়ানো হবে। যে ডাকাত সম্পদ কেড়ে নেবে কিন্তু কাউকে হত্যা করবে না, তাকে শুধু হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটা হবে। যে ডাকাত শুধু রক্তপাত করবে এবং সম্পদ হরণ করবে না তাকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যাও করবে না, সম্পদও হরণ করবে না, কিন্তু অস্ত্র নিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে, তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। এটি শাফেঈ মাযহাবের মত। ইমাম শাফেঈ আরো বলেন, প্রত্যেককে তার অপরাধের মাত্রা অনুসারে শাস্তি দেয়া হবে। হত্যা ও শূল দুটোই যার প্রাপ্য, তাকে প্রথমে হত্যা করা হবে অথবা ৩ বার শুলে চড়িয়ে নামিয়ে রাখা হবে যাতে তার শাস্তি কে খুবই ঘৃণ্য ভাবে প্রকাশ করা যায়। আর যার কেবল হত্যার শাস্তি প্রাপ্য তাকে হত্যা করে লাশ আপনজনদের হাতে অর্পণ করতে হবে।[৯৭]

আল-কুরআন এর ঘোষণা "অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে" -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রা. বলেন : যাকে ধরা সম্ভব হবে না তার সম্পর্কে সরকার ঘোষণা দিয়ে দেবেন যে, যে ব্যক্তি তাকে ধরতে পারবে, সে যেন তাকে হত্যা করে। আর যে ধরা পড়বে, তাকে গ্রেফতার করে জেলে বন্দি করতে হবে। কেননা এতে করে অপরাধ বন্ধ হবে এবং এটাই তার বহিষ্কার। শুধু হত্যার ভয় দেখানো এবং সন্ত্রাস ছড়ানোই কবীরা গুনাহ। এর ওপর কেউ যদি জিনিসপত্র ছিনতাইও করে এবং খুন-জখমও করে, তবে সে তো এক সাথে অনেকগুলো কবীরা গুনাহ সংঘটিত করে। এ ছাড়া এ ধরনের অপরাধিরা সাধারণত মদখোরী, ব্যভিচার, সমকাম, নামায তরক ইত্যাদি কবীরা গুনাহেও লিপ্ত থাকে।[৯৮]

---

৯৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৫, হাদীস নং- ৮৬

৯৭. আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানীয়্যাহ*, মিশর : মুস্তাফা আল-হালাবী প্রেস, তা.বি., পৃ. ৬২।

৯৮. ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯২।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ভাষ্যে বলা হয়েছে, যদি কোন লোক উপরে বর্ণিত ডাকাতির সংজ্ঞায় বর্ণিত কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে তাহলে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারা মোতাবেক ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।[৯৯] আর এ ডাকাতি যদি প্রকাশ্য রাজপথে সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে তার শাস্তির মেয়াদ ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।[১০০]

### সাত. অপহরণ ও পাচারের মাধ্যমে উপার্জন

মানব পাচার ও অপহরণের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করা ইসলাম ও প্রচলিত আইনে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অপহরণ একটি জঘন্য অপরাধ। রসূল স. দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, "তোমাদের এ শহরে আজকের দিন ও এ মাসের মতই তোমাদের পরস্পরের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সম্মানীয়। প্রত্যেক মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে চলতে দিতে হবে। এটা তার অধিকার। অপহরণের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে চলার অধিকারকে হরণ করা হয়। তাছাড়া অপহরণকারী অপহৃত ব্যক্তিকে সাধারণত যেসব কাজে নিয়োজিত করে তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনৈতিক ও অমানবিক। তাই এ অপরাধের সাথে জড়িত প্রায় সব দিক অবৈধ। আর অপহরণের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করা একটি প্রতারণা। ইসলামী আইনে সকল প্রকার প্রতারণা হারাম। প্রতারণা ও ধোঁকাবাজীকে অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে আল্লাহ্ বলেন : আর এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে এর শীর্ষস্থানীয় অপরাধী লোকদেরকে এমনই করেছি যেন তারা নিজেদের ধোঁকা, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে।[১০১] এ প্রসঙ্গে রসূল স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১০২]

অপহরণ শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি জঘন্য অপরাধ। তাই ইসলামে অপহরণের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। আর অপহরণের ক্ষেত্রে সাধারণত চুরি ও প্রতারণাই প্রধান কৌশল হিসেবে অনুসৃত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যে কৌশলই অবলম্বন করা হোক না কেন, সার্বিকভাবে ইসলাম তা অবৈধ বলে সাব্যস্ত করেছে। কোন মানুষকে বিক্রি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এমনকি নিজের সন্তানকেও বিক্রি করার কারো অধিকার নেই।[১০৩] কেননা, মানুষ অতীব সম্মানীয়। আল্লাহ বলেন, "আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।[১০৪]

---

৯৯. গাজী শামছুর রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, ধারা-৩৯২

১০০. প্রাগুক্ত, ধারা-৩৯৫

১০১ আল-কুরআন, ৬ : ১২৩ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ

১০২ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قال من غش فليس منا ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুবাদ : মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল গাশশি ফিল-বুয়ু, খ. ৩, পৃ. ৬০৬।

১০৩ ইমাম ইবনে হাযম, *মারাতিবুল ইজমা*, মিসর, মাতবাআতুল কুদস, ১৩৫৭, পৃ. ৮৪।

১০৪ আল কুরআন, ১৭ ঃ ৭০ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

প্রচলিত আইনের দণ্ডবিধির ভাষ্যে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হতে গমন করিবার জন্য জোরপূর্বক বাধ্য করে বা কোন প্রতারণামূলক উপায়ে প্রলুব্ধ করে সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোন লোক উক্ত অপরাধে অপরাধী হয় তাহলে তার শাস্তির মেয়াদ সাত বছর কারাদণ্ড এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।[১০৫]

যে ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে দাস আমদানি, রপ্তানি, অপহরণ, ক্রয়-বিক্রয় করে বা দাসের কারবার করে সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার অনূর্ধ দশ বছর মেয়াদী করাদণ্ডে তদুপরি অর্থে দণ্ডিত হবে।[১০৬]

এ সম্পর্কে ২০০০ সালে জাতীয় গেজেটের ৮ নং আইনের ৭ ধারায় নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ধারা-৫ এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্যূন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক করেন, তা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

**নয়. ওজনে কম দেয়া**

ওজনে কম দিয়ে সম্পদ উপার্জন করা ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং যারা এমন জঘন্যতম কাজে লিপ্ত থাকবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে। এ প্রসেঙ্গ মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনে ঘোষণা করেন : "যারা ওজনে ও মাপে কম দেয়, তাদের জন্য সর্বনাশ। যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে আনার সময় ঠিকমত আনে, আর মেপে দেয়ার সময় কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে মহাদিবসে? যে দিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে। কখনও না, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে। সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান? তা চিহ্নিত আমলনামা। সেই দিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের, যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে, কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী *এটি* অস্বীকার করে।"[১০৭]

ইমাম সুদ্দী বলেন : রসূল স. যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন তখন সেখানে অনেক লোক দেখতে পেলেন যারা নিজের জিনিস মেপে নেয়ার সময় বেশি নিত এবং অপরকে দেয়ার সময় ওজনে কম দিত; তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন।[১০৮]

---

১০৫. গাজী শামছুর, রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, ধারা-৩৬২ ও ৩৬৩

১০৬. প্রাগুক্ত, ধারা-৩৭১

১০৭. আল-কুরআন, ৮৩ : ১-১১

১০৮. ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত :

রসূল স. বলেছেন : "পাঁচটি জিনিসের ফলে পাঁচটি জিনিস অনিবার্য। সে পাঁচটি বিষয় হলো : কোন জাতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে আল্লাহ্ তার ওপর তার শত্রুকে চাপিয়ে দেবেন। কোন জাতি আল্লাহর বিধান ছাড়া মনগড়া বিধান দ্বারা দেশ শাসন করলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়বে, কোন জাতিতে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে তাদের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, মাপে ও ওজনে কম দিলে ফসল কম হবে ও দুর্ভিক্ষ হবে, আর যাকাত দেয়া বন্ধ করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে।"[১০৯] এখানে স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় যে, মাপে কম দেয়া ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে তিল তিল করে অলক্ষে চুরি করে এবং হারাম উপার্জন করে।

**দশ. জবর দখল**

জবর দখল করা ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ। এ নিষিদ্ধ কাজটি সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। জোরপূর্বক মানুষের সম্পদ হরণ, জোর পূর্বক অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, মানুষকে প্রহার করা, গালিগালাজ করা, বিনা উস্কানিতে কারো ওপর আক্রমণ চালানো এবং আর্থিক, দৈহিক ও মর্যাদার ক্ষতিসাধন এবং দুর্বলদের ওপর নৃশংসতা চালানো ইত্যাদিকে জবর দখল বলে। এটি ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "জালিমদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহকে উদাসীন মনে করো না। আল্লাহ তাদেরকে শুধু একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে, তারা মাথা নিচু করে দৌড়াতে থাকবে, তাদের চোখ তাদের নিজেদের দিকে ফিরবেনা এবং তাদের হৃদয়সমূহ দিশেহারা হয়ে যাবে। মানুষকে আযাব সমাগত হওয়ার দিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও। সেদিন জুলুমবাজরা বলবে : হে আমাদের প্রভু! অল্প কিছুদিন আমাদেরকে সময় দিন, তাহলে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করবো এবং রসূলদের অনুসরণ করবো। তোমরা কি ইত:পূর্বে কসম খেয়ে বলতে না যে তোমাদের পতন নেই। যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে,

---

عن بن عباس قال لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عزوجل ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك.

ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৫০৮, হাদীস নং-১১৬৫৪

১০৯. ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خمس بخمس قالوا : يا رسول الله وما خمس بخمس ؟ قال : ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر.

-আত-তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪৫, হাদীস নং-১১০১৪

তোমরা তো তাদের বাসস্থানেই বাস করেছ এবং সেই সব জালেমের সাথে আমি কেমন আচরণ করেছি, তা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। উপরন্তু আমি তোমাদের জন্য বহু উদাহরণ দিয়েছি।"[১১০]

রসূল স. বলেন : "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও অন্যের জমি জবর দখল করবে, কিয়ামতের দিন তার ঘাড়ে সাতটি পৃথিবী চাপিয়ে দেয়া হবে।"[১১১]

প্রচলিত আইনে, অন্যায়ভাবে অন্যের ভূমিতে প্রবেশ করা অথবা ভূমির দখলে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করাকে ভূমিতে অনধিকার প্রবেশ বা ভূমি ট্রেসপাস বলে।[১১২]

অন্যের অঙ্গনে যথার্থ কারণ ছাড়া প্রবেশ করলে ট্রেসপাস সংঘটিত হয়। এ উদ্দেশ্যে বিবাদীর সম্পূর্ণ প্রবেশ প্রয়োজন হয় না। প্রধান ফটকে সামান্যতম অঙ্গুলী প্রবেশই যথেষ্ট। এ ছাড়া জানালায় হাত ঢুকানো, দেওয়ালে হেলান দেয়া, অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলক্রমে প্রবেশ করা এ অপকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বলপূর্বক কারো কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করবে তার শাস্তির মেয়াদ তিন বছর কারাদণ্ড অথবা অর্থ দণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[১১৩] আর এ বলপূর্বক কোন কিছু গ্রহণের মাধ্যমে যদি ভিকটিমের কোন ক্ষতি হয় তাহলে তার শাস্তির মেয়াদ পাঁচ বছরের কম নয়।[১১৪] আর বলপূর্বক বা জোর করে কাউকে মৃত্যুর ভয় দেখালে তার শাস্তি সাত বছরের কম নয়।[১১৫]

---

১১০. আল-কুরআন, ১৪ : ৪২-৪৫ :

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ . مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ . وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ . وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ .

১১১. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين . ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৬৬, হাদীস নং- ২৩২০

১১২. এ.বি. সিদ্দিক, *টর্ট আইন*, ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০০৩, পৃ. ৫৬।

১১৩. গাজী শামছুর রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, ধারা-৩৮৪।

১১৪. প্রাগুক্ত, ধারা-৩৮৫।

১১৫. প্রাগুক্ত, ধারা-৩৮৭।

ক্ষতিপূরণের মামলায় বলা হয়েছে যে, জমি পুনরুদ্ধারের মামলা ছাড়াও দখলচ্যুত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারে। বেদখল হতে উদ্ভূত যাবতীয় ক্ষতিসহ দখল উদ্ধার বাবদ যাবতীয় খরচ সে দাবি করতে পারে। অবশ্য বিবাদী ভূমির বা গৃহাঙ্গনের উন্নতিকল্পে খরচ করে থাকলে সেগুলোর জন্য সেট্ অফ (Set off) দাবি করতে পারে কি-না সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেই। তবে প্রখ্যাত টর্ট আইন বিশারদ স্যামন্ডের মতামত উল্লেখযোগ্য।[১১৬] তিনি বলেন : যেহেতু বেদখলের ফলে উদ্ভূত ক্ষতিপূরণের জন্য বাদীর দাবি, এটা নীতিগতভাবে পরিস্কার যে, বিবাদী উক্ত অঙ্গনের যে মূল্য বৃদ্ধি করেছে তা' বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিবাদী যদি পুরাতন ঘর ভেঙ্গে নতুন গৃহ নির্মাণ করে থাকে, তবে এটা যথার্থ হবে না যে, বাদী নতুন গৃহের দখল এবং পুরাতন গৃহের মূল্য আদায় করতে পারবে।[১১৭]

### এগার. পতিতাবৃত্তি

স্বাভাবিক যৌনকার্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্যতম। এর সমাধান না হলে মানুষ তার জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সম্পাদন করা গর্হিত কাজ।

কোনো নারী স্বেচ্ছায় নিজেকে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত করতে পারবে না। এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্য কেউ তাকে দিয়ে দেহ ব্যবসায় পরিচালনা করতে চাইলে তাও নিষিদ্ধ। আল-কুরআনে এসেছে, "তোমরা যুবতীদের দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য করো না।"[১১৮] কুরআনের আরো ঘোষণা, "তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ।"[১১৯] মহানবী স. বলেন, "কোন ব্যক্তি মু'মিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না।"[১২০] ইসলাম ব্যভিচার ও দেহ ব্যবসায়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পর্ণোগ্রাফি ছবি তৈরি অশ্লীলতা ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচায়ক। তরুণ-যুব-শিশু চরিত্র হনন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম যে কোন প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছে। আল-কুরআন বলেন, "তোমরা কোনো ধরনের প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়ো না।"[১২১]

চারিত্রিক ও সামাজিক শৃংখলা বিনষ্টকারী উপকরণের ব্যবসা বা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ আয় করাকেও ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "নিশ্চয়

---

১১৬. এ.বি. সিদ্দিক, *টর্ট আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

১১৭. প্রাগুক্ত

১১৮. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

১১৯. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

১২০. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯ ; ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৭।

১২১. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার করাকে পছন্দ করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ্ যা জানেন তা তোমরা জান না।"[১২২]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "তোমাদের দাসীরা পবিত্র ও সতী-সাধ্বী থাকতে চাইলে দুনিয়ার স্বার্থ লাভের জন্য তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করো না। তবে তাদের উপর কেউ জবরদস্তি করলে সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তাদের উপর ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[১২৩]

ইসলাম যেনা-ব্যভিচার সমর্থন করে না। এ সমস্ত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ্ মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে তাদের উভয়ের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন : "ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী যেনা করলে উভয়ের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগে তোমাদের উভয়ের ব্যাপারে নম্রতা দেখানো যাবে না, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে থাক। আর মু'মিনদের একটি দল উভয়ের শাস্তি প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করবে। যেনাকারী পুরুষ যেনাকারিনী বা মুশরিক স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে না আবার যেনাকারিনী মহিলা যেনাকারী বা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে না। আর এরা মুমিনদের জন্য হারাম।"[১২৪]

রসূল স. বলেছেন : ".. আমার নিকট থেকে নিয়ে নাও, আল্লাহ্ ঐ সকল মহিলার জন্য পথ বের করে দিবেন। যুবক-যুবতী যেনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন। আর বিবাহিত মহিলা ও পুরুষ যেনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও পাথর দ্বারা রজম।"[১২৫]

---

১২২. আল-কুরআন, ২৪ : ১৯ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

১২৩. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১২৪. আল-কুরআন, ২৪ : ২-৩

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

১২৫. উবাদা ইবনে সামিত রা. হতে বর্ণিত :

عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا

এমনিভাবে আরো অনেক হাদীস রসূল স. থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত যে, এসকল খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা এবং অপরকে বিরত থাকা।

প্রচলিত আইনে পতিভাকৃত্তিকে জঘন্য অপরাধ মনে করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ভাষ্যে বলা হয়েছে : "যে ব্যক্তি ১৮ বছরের কম বয়স্কা কোন ব্যক্তি যে কোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য কোন লোকের সহিত অবৈধ যৌন সম্পর্ক অথবা কোন বে-আইনি ও অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে এই উদ্দেশ্যে কিংবা অনুরূপ ব্যক্তি যে কোন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে এইরূপ সম্ভাবনা জানিয়া তাহাকে বিক্রয় করে, ভাড়া দেয় বা প্রকারন্তরে হস্তান্তর করে সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"[১২৬]

যে ব্যক্তি ১৮ বছরের কম বয়স্কা কোন ব্যক্তি যে কোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য কোন লোকের সহিত অবৈধ যৌন সম্পর্ক অথবা কান বে-আইনি ও অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে এই উদ্দেশ্যে কিংবা অনুরূপ ব্যক্তি যে কোন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে এইরূপ সম্ভাবনা জানিয়া তাহাকে ক্রয় করে, ভাড়া দেয় বা প্রকারন্তরে হস্তান্তর করে সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ ১০ বছর পর্যন্ত হইতে পারে দণ্ডিত হইবে তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।[১২৭]

**বার. মানবপাচারের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ**

'পাচার' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Trafficking, Kidnapping, Smuggling.[১২৮] শব্দটির প্রচলিত অর্থ হচ্ছে, অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে কোন জিনিস যথাযথ স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া।[১২৯]

অবৈধ উপার্জনের অন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে মানবপাচার। নারী ও শিশু পাচারের মত জঘন্য অপরাধের প্রবণতা আগেও ছিল,[১৩০] বর্তমানেও আছে।

---

عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة .

- ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদ্দুয যিনা, খ.৫, পৃ. ৫৯, হাদীস নং-৩২০০; মুসলিম, অধ্যায় : .......... অনুচ্ছেদ : ইমাম, তিরমিযী, আস-সুনান, বৈরূত, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি, অনুচ্ছেদ : *মাজা'আ ফী হাদ্দির রজম,* খ.৫, পৃ. ৩৩৮।

১২৬. গাজী শামসুর, রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য,* ধারা-৩৭২

১২৭. প্রাগুক্ত, ধারা-৩৭৩

১২৮. *Bangla English Dictionar*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৫, পৃ. ৪১৮।

১২৯. *The SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prpstitution.* Articles- 1. Definitions, p.1 - 5.

জাহিলী যুগে আরবেও শিশু পাচারের ঘটনা দেখা যায়।[১৩১] অবশ্য শিল্প বিপ্লবের পর এর বিস্তার এত বেশি হয়েছে যে, তা সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগে অর্থ উপার্জনের সহজ মাধ্যম হিসেবে একটি দেশী-বিদেশী দুষ্টচক্র লোক পাচার করার কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে ইসলামে। অপরাধগুলোকে শাস্তির স্তরভেদে তিন ভাগে ভাগ করা হয় : ১. হুদূদ[১৩২] সংক্রান্ত অপরাধ ২. কিসাস ও দিয়াত[১৩৩] সংক্রান্ত অপরাধ এবং ৩. তা'যীর[১৩৪] সংক্রান্ত অপরাধ।

ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ যাই হোক না কেন তা উল্লেখিত তিন প্রকারের শাস্তি পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাচার কিসাস এর শাস্তি আরোপ করার মত অপরাধ

---

১৩০. আল-কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইউসুফ আ. কে খ্রিস্টপূর্ব কয়েক বছর পূর্বে একদল ব্যবসায়ী কূপ থেকে তুলে মিসরে পাচার করে নিয়ে যায় এবং বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ্ বলেন :
وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
আল কুরআন, ১২ : ১৯-২০

১৩১. উদাহরণস্বরূপ যায়িদ ইবনে হারিছার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি পাচার হয়ে দাস জীবন যাপন করেন। পরে রসূলুল্লাহ স. ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। ইবনে হাজার 'আসকালানী, *তহযীবুত তাহযীব*, খ.২, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি, পৃ. ২৩৪-২৩৫; ইবনে কাসীর, *আলবিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি., পৃ.২০৩-২০৪।

১৩২ হুদূদ সংক্রান্ত অপরাধ : হুদূদ সংক্রান্ত অপরাধ বলতে ঐসব অপরাধকে বুঝায় যার জন্য আল্লাহ তাআলা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন : ব্যভিচার, মদ্যপান, চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ করা, মিথ্যা অপবাদ, ধর্ম ত্যাগ ও বিদ্রোহ/ রাষ্ট্রদ্রোহিতা। -ইমাম আল-মাওয়ারদী, *আহকাম আস-সুলতানিয়্যাহ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, পৃ. ১৯২-১৯৫।

১৩৩ কিসাস ও দিয়াহ সংক্রান্ত অপরাধ : কিসাস ও দিয়াত সংক্রান্ত অপরাধ বলতে ঐসব অপরাধকে বুঝায় যার জন্য হুবহু অপরাধ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা নির্ধারিত জরিমানা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। মযলুম ব্যক্তি নিজে কিংবা তার উত্তরাধিকাণ তা ক্ষমা করে দেবার অধিকার রাখে। যেমন : ইচ্ছাকৃত হত্যা, প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা, ভুলে হত্যা, ইচ্ছাকৃত শারীরিকভাবে আহত করা, ভুলে শারীরিক ক্ষতি সাধন করা। আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ওয়াল বিলায়াতিদ দীনিয়্যাহ*, মিসর : মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাভী, ১৩৯৩, পৃ. ১৮২।

১৩৪ তা'যীর সংক্রান্ত অপরাধ হচ্ছে ঐসব অপরাধ যার ব্যাপারে শরী'আতে সুনির্দিষ্টভাবে কোন শাস্তির উল্লেখ করে নি, যা নির্ধারণ করার ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। দেশ ও জনগণের কল্যাণে সরকার জনসাধারণকে সতর্ককরণ করা থেকে শুরু করে শাস্তির ভয়াবহতা অনুযায়ী সবশেষে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত যে কোন শাস্তি প্রদান করতে পারে। এ ধরনের অপরাধের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। যেমন- সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, গালমন্দ করা ইত্যাদি। -ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী ফিল-ফিকহ* বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৫, পৃ. ৪৮০।

নয়, আবার হুদূদ সংক্রান্ত যতটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে তারও আওতাভুক্ত নয়। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি প্রতারণামূলক কাজ। প্রতারণার মাধ্যমে পাচারকারীরা মানুষকে ক্ষতিকর ও সমাজবিরোধী কাজের সাথে সম্পৃক্ত করছে। তাই এটি তা'যীর সংক্রান্ত অপরাধসমূহের একটি অপরাধ।

এ প্রসঙ্গে মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন : "প্রতারণার মাধ্যমে পাচারের শাস্তি বিধানে সরকার তার ধরন ও ভয়াবহতার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড, চাবুক মারা, জেলে আটকে রাখা, নির্বাসনে দেয়া, মাল ক্রোক করা, শোকজ নোটিশ, সতর্কীকরণ নোটিশ, সশরীরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ, বয়কট করা, ভর্ৎসনা করা ও উপদেশ দেয়া ইত্যাদির যে কোন শাস্তি নির্ধারণ করতে পারে।"[১৩৫]

তবে যদি পাচারকারী কোন নারীকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে অথবা অপহরণ করে পাচার করে, তবে তার উপর অপহরণের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি (হাদ্দুল হিরাবা) প্রযোজ্য হবে। আর যদি কেউ শিশুকে চুরি করে পাচার করে তবে তাকে তা'যীর হিসেবে রাষ্ট্র যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারে।[১৩৬]

২০০০ সালের বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাশকৃত নারী ও শিশু অধিকার সম্পর্কিত ৮ আইনের ৫ নং ধারায় পাচারের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

ক) যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনি বা নীতিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা উক্তরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

খ) যদি কোন ব্যক্তি নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত হইতে চুরি করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (ক) এ উল্লেখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

**তের. আমানতের খিয়ানত**

আমানতের খিয়ানত একটি জঘণ্য কাজ এবং এর দ্বারা উপার্জিত সম্পদও হারাম। আল্লাহ বলেন : "তোমাদের কাউকে যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছুর আমানতদার বানায় বা কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে সে যেন উক্ত আমানত প্রাপককে পরিশোধ করে দেয় এবং সে যেন (এ ব্যাপারে) তার রব আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী।

---

[১৩৫] ইমাম ইবনে তাইমিয়া, *আল-হিসবাহ*, আল-কাহেরা : মাতবা'আতুল মুয়াইয়িদ, ১৩১৮, পৃ. ৪০

[১৩৬] ইমাম ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী ফিল ফিকহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১২ পৃ. ৪৮০।

তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।"[১৩৭] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের খেয়ানত করো না। অথচ তোমরা জান।"[১৩৮] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন : "আর কোন নবীর জন্য কোন কিছু আত্মসাৎ করা মানানসই নয়, আর যে ব্যক্তি কোন কিছু আত্মসাৎ বা গোপন করবে, কিয়ামতের দিন সে উক্ত আত্মসাৎকৃত বস্তুসহ উপস্থিত হবে; অতঃপর প্রত্যেককে তার পরিপূর্ণ বদলা দেয়া হবে এবং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।"[১৩৯]

মুফাসসিরগণ বলেছেন : এ আয়াত সাহাবী আবু লুবাবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। বনু কুরাইযা গোত্রের পল্লীতে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা বসবাস করছিল। রসূল স. বনু কুরাইযাকে অবরোধ করে রেখেছিলেন। তিনি আবু লুবাবাকে কোন প্রয়োজনে বনু কুরাইযার কাছে পাঠিয়েছিলেন। বনু কুরাইযার লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : "হে আবু লুবাবা! আমাদের ব্যাপারে রসূলের রায় অনুসারে আমরা যদি নেমে আসি, তা হলে আমাদের কি হবে বলে তোমার মনে হয়? আবু লুবাবা নিজের গলার দিকে ইংগিত দিয়ে বুঝালেন, তোমাদেরকে যবাই করা হবে। কাজেই নেমে এসো না। তাঁর এ কাজটি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা ছিল। আবু লুবাবা নিজেও স্বীকার করেন যে, আমি কাজটি করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে, আমি খিয়ানত করে ফেলেছি। এরপর আবু লুবাবা মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে নিজেকে ছয়দিন যাবত বেঁধে রাখেন এবং তাঁর তাওবা কবুল হবার ঘোষণা আসার পরই নিজেকে মুক্ত করেন।[১৪০]

ইবনে মাসউদ রা. বলেন : "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত বরণকালে আমানতের খিয়ানত ব্যতীত সকল গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আমানতে খেয়ানতকারীকে কিয়ামতের দিন হাজির করা হবে এবং বলা হবে, তোমার আমানত ফেরত দাও। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে ফেরত দেব? দুনিয়ার তো ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন তার কাছে যে জিনিসটি আমানত রাখা হয়েছিল, তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থলে হুবহু যে আকারে রাখা হয়েছিল সেই আকারে দেখানো হবে। অতপর বলা হবে, তুমি ওখানে নেমে যাও এবং ওটা বের করে নিয়ে এসো। অতপর সে নেমে যাবে এবং জিনিসটি

---

১৩৭. আল-কুরআন, ২ : ২৮৩ ... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

১৩৮. আল-কুরআন, ৩ : ৬১ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

১৩৯. আল-কুরআন, ৮ : ২৭
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

১৪০. আল-বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭১, হাদীস নং-৭৫২৭

ঘাড়ে করে নিয়ে আসবে। জিনিসটি তার কাছে দুনিয়ার সকল পাহাড়ের চেয়ে ভারী মনে হবে। সে মনে করবে যে জিনিসটি নিয়ে আসলে সে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু জাহান্নামের মুখের কাছে আসা মাত্র আবার আমানতের জিনিসসহ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পড়ে যাবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. তিলাওয়াত করলেন (এই আয়াত) : "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে (আল-কুরআন, ৪ : ৫৮)।"[১৪১]

## চৌদ্দ. যাদু করা

আমাদের সমাজে যাদু-টোনা করে বিভিন্ন জঘণ্যতম কাজের মাধ্যমে একশ্রেণীর লোকজন উপার্জনের পথ খুলে নিয়েছে। অথচ এ যাদু-টোনা কবীরা গুনাহের মধ্যে অন্যতম একটি গুনাহ। যাদু কবীরা গুনাহ হওয়ার কারণ এই যে, এ কাজ করতে হলে কাফির না হয়ে করা সম্ভব হয় না। আল্লাহ বলেন : "শয়তানরা কুফরিতে লিপ্ত হয়ে মানুষকে যাদু শিক্ষা দিতো।"[১৪২]

মূলত অভিশপ্ত শয়তান মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা। হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফিরিশতার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : "তারা উভয়ে কাউকে যাদু শিক্ষা দেয়ার আগে এ কথা বলে দিত যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তোমরা কুফরিতে লিপ্ত হয়ো না। তারপর তাদের কাছ থেকে লোকেরা এমন যাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। অথচ তারা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না। তারা যে যাদু শিখতো তা তাদের শুধু ক্ষতি করতো, উপকার করতো না। আর তারা এ কথাও জানত যে, যে ব্যক্তি যাদু আয়ত্ত করবে, আখিরাতে সে কোন অংশ পাবে না।"[১৪৩]

---

১৪১. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত :

عن ابن مسعود قال : القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة يؤتى بصاحبها وإن كان قتل في سبيل الله فيقال له : أد أمانتك فيقول : رب ذهبت الدنيا فمن أين أؤديها فيقول : اذهبوا به إلى الهاوية حتى إذا أتى به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته كيوم دفعت إليه فيحملها على رقبته يصعد بها في النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين وقرأ عبد الله (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها).

ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৮, হাদীস নং-১৩০৬৭

১৪২. আল-কুরআন, ২ : ১০২ وَلَكِنَّ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

১৪৩. আল-কুরআন, ২ : ১০২ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

ইসলামী বিধান মতে যাদুকরের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। কারণ তা আল্লাহর সাথে কুফরি অথবা কুফরির পর্যায়ভূক্ত। রসূল স. যে হাদীসে "সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ" ত্যাগ করতে বলেছেন, তাতে যাদুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১৪৪]

পথভ্রষ্ট বহু মানুষকে যাদুর আশ্রয় নিতে দেখা যায়। কারণ তারা একে শুধু একটা হারাম কাজ মনে করে। আসলে যাদুও যে কুফরী তা তারা জানে না। স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো, বেগানা পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রণয় সৃষ্টির কাজে এমন সব মন্ত্র পড়ে যাদু করা হয়, যার বেশির ভাগ শিরক ও কুফরিতে পরিপূর্ণ। কাজেই আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায় ক্ষতিকর এমন কাজের ধারে কাছে যাওয়া উচিত নয়। হাদীসে এসেছে : "যাদুকরের শাস্তি হত্যা করা"[১৪৫]

### পনের. ভিক্ষা বৃত্তি

পরিশ্রম না করে পরনির্ভরশীল হয়ে জীবন পরিচালনা করা ইসলামসম্মত নয়। বরং তা ঘৃণিত কাজ। আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষের জন্য তার রিযিকের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মানুষ পরিশ্রমের মাধ্যমে হালাল উপায়ে উপার্জন করে নিজে খাবে এবং পরিবার-পরিজনকে খাওয়াবে। মানুষ স্বীয় কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উপার্জন না করে বসে বসে খাবে তা ইসলাম সমর্থন করে না। এ জন্যই ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ভিক্ষা করার অর্থ হলো তার মধ্যে অন্তর্নিহিত আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা ও উপার্জন-প্রতিভাকে কাজে না লাগানোর ফল। তাই-ই নয় শুধু, সে মনুষ্যত্বের চরম অপমানও করে।

---

১৪৪. عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات . -আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রসূল স. বলেছেন : "তোমরা সাতটি ভয়াবহ গুনাহ থেকে বিরত থাকো। (ক) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, (খ) যাদু করা, (গ) শরীয়তের বিধিসম্মতভাবে ছাড়া কোন অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটানো, (ঘ) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করা, (ঙ) সুদ খাওয়া, (চ) যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো এবং (ছ) সরলমতি সতীসাধ্বী মু'মিন মহিলাদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ। ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০১৭, হাদীস নং-২৬১৫।

১৪৫. عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حد الساحر ضربة بالسيف ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং-১৬২৭৭।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রসূল স. বলেছেন : "তোমাদের কেউ তার পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে বিক্রি করা, কারো নিকট ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম্ চাই সে দিক বা না দিক।"[১৪৬]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন : "লোকদের কাছে ভিক্ষা করলে অবশেষে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে তখন তার মুখমণ্ডলে এক টুকরাও গোশত থাকবে না।"[১৪৭]

সাহল ইবনে হানযালিয়া বলেন , রসূল স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায় অথচ তা বেঁচে থাকার সম্বল তার আছে, নিশ্চয় সে অধিক আগুন সংগ্রহ করছে।"[১৪৮]

ইমাম আবূ হানীফা র. এর মতে : "যার কাছে দু'বেলার খাবার আছে, তার জন্য সাওয়াল করা জায়েয নয়"।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ঢাকা শহরে ১৪৯৯৯ জন ভাসমান লোক রয়েছে। এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১১৭১৭ জন এবং পুরুষের সংখ্যা ৩২৮৩ জন। ভাসমান লোক তারা-যারা খোলা আকাশের নিচে, রাস্তায়, মাজারে, বাস টারমিনালে, রেলওয়ে স্টেশনে, প্যাসেঞ্জার সেডে, স্টেডিয়ামের বারান্দায়, সরকারী ও বেসরকারী অফিসে, ফুটপাত ও পার্কে রাত্রীযাপন করে।

রাষ্ট্রীয় আইনে ভিক্ষাবৃত্তিতে কাউকে উৎসাহিত বা নিয়োজিত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের দন্ডবিধির ভাষ্যানুযায়ী : "যিনি কোনো ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করেন বা তৎকর্তৃক ভিক্ষা করান অথবা যিনি কোনো শিশুর হেফাজত, দায়িত্ব বা তত্ত্বাবধানে থাকাকালে উক্ত শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করতে বা তৎকর্তৃক ভিক্ষা করাতে অপসহায়তা বা উৎসাহ দান করেন তিনি তজ্জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।"[১৪৯]

---

১৪৬. لأن يحتطب أحدكم حزمة على طهره خير له من أن يسأل أحدا -ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.২, প. ৭৩২, হাদীস নং-১৯৬৮।

১৪৭. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم -ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৫৩৬, হাদীস নং-১৪০৫।

১৪৮. من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৩৫, হাদীস নং-১৬৩১।

১৪৯. বাংলাদেশ *দণ্ডবিধির* ভাষ্য, ধারা-১৯

**ষোল. মডেলিং**

মডেলিং একটি পেশা। এটি যদি ইসলাম পরিপন্থী না হয় তাহলে তা জায়েয, অন্যথায় তা হারাম। কেননা বর্তমান মডেলিংয়ের মধ্যে যে সকল বেপর্দা ও অর্ধ-উলঙ্গ এবং বেহায়াপনা চিত্র দেখা যায় কোনক্রমেই তা ইসলামে সমর্থিত নয়। আর এ উপার্জিত সম্পদও হালাল হতে পারে না। বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির সহযোগী অনুষঙ্গ হিসেবে মডেলিং ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। আধুনিক অর্থনীতি বলে বিজ্ঞাপন ব্যতীত কোনো পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞাপনের সাথে মডেলিংয়ের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তারকা খ্যাতিকে পণ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে পণ্যকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং তার চাহিদা সৃষ্টির কৌশল সর্বজনবিদিত। তেমনি পণ্যের বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে অনেক ব্যক্তি প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হতে পারে। মডেলিং একটি স্বতন্ত্র পেশায় পরিণত হয়েছে। পণ্যের বাজার সম্প্রচারিত হচ্ছে সে ক্ষেত্রে মডেলিংয়েরও জনপ্রিয়তা বাড়ছে। প্রায় সারা বিশ্বে মডেলিংয়ের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আমাদের দেশেও সে রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। বিদেশে ৬০% অর্থ বিজ্ঞাপন খাতে ব্যয় হয়। সেখানে মডেলদের পারিশ্রমিক উচ্চমূল্যের। ইসলাম অপ্রয়োজনীয়ভাবে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সমর্থন করে না, কারণ মডেলিংয়ের দ্বারা পণ্যের গুণগতমান বাড়ে না।

**উপসংহার**

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যায়-অনাচার ও অবৈধ পন্থায় উপার্জনের ছড়াছড়ি। এর মধ্য থেকে আমাদের সঠিক ও বৈধ পন্থায় উপার্জন করে তা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, সৎভাবে যে কোনো কাজই হোক না কেন তা পবিত্র, যতই তা নগণ্য হোক না কেন। হালাল উপার্জন আল্লাহর পছন্দনীয়, বেকার লোককে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়া ঈমানী দায়িত্ব, কাজের বিনিময়ে মজুরি প্রদান ও গ্রহণ সম্পূর্ণ বৈধ। বেতন সম্মানজনক হতে হবে যাতে পরিবারসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ হতে পারে, চাকরির পূর্বেই বেতন মজুরি নির্ধারণ করে নিতে হবে, মালিকের পক্ষ থেকে একতরফাভাবে কোন চুক্তি ও শর্ত শ্রমিকের ওপর চাপিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ অন্যায়। কাজের সময় ও মেয়াদ নির্ধারিত থাকতে হবে, মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক হবে আত্মীয়তার মত, অসহায় মানুষকে সাহায্য করা ঈমানদার লোকদের দায়িত্ব। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বৈষম্যের অবসান, চাকরির শর্ত ও চুক্তি নির্ধারণ হবে উভয়ের সম্মতিতে এবং কেউই চুক্তি লঙ্ঘন করবে না, উত্তম শ্রমিকের পরিচয় হলো, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ততা আর উত্তম মালিকের পরিচয় হলো, জালিম হবে না, সৎকর্মপরায়ণ হবে, সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দিবে না, শ্রমিকের চুক্তি করার ও কথা বলার স্বাধীনতা আছে, ঈমানদারগণ সকল কাজ আল্লাহর বিধান মোতাবেক সম্পন্ন করবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩০
এপ্রিল-জুন : ২০১২

# ব্যবসায়-বাণিজ্যে ক্রেতার স্বাধীনতা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ড. মো. মাসুদ আলম*

*[সারসংক্ষেপ : ব্যবসায়-বাণিজ্যে দুটি পক্ষ থাকে- ক্রেতা এবং বিক্রেতা। আধুনিক যুগে পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে একদিকে ক্রেতার পছন্দের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে, অন্যদিকে পণ্য ক্রয় করে ক্রেতাসাধারণ প্রতিনিয়ত ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হচ্ছে। এমতাবস্থায় ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতা পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হচ্ছে না। ইসলামের বাণিজ্যনীতিতে ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকৃত। এ কারণে প্রতারণা বা ঠকার আশংকা থাকলে ক্রেতা শর্তযুক্ত লেনদেন করতে পারে। পণ্যের দোষ-ত্রুটির কারণে পরবর্তীতে তা ফেরত বা পরিবর্তনের সুযোগ ইসলামের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতিতে রয়েছে। এ প্রবন্ধে সম্পদ-এর পরিচয় হালাল সম্পদ উপায়ে উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা এবং অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।]*

## বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থায় ক্রেতার স্বাধীনতা

**পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় ক্রেতার স্বাধীনতা :** মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ক্রেতাসাধারণ তথা ভোক্তারা একটি শক্তিশালী পক্ষ। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন বিক্রেতাকে ক্রেতার পছন্দের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হয়। তত্ত্বগতভাবে একজন বিক্রেতার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড ক্রেতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে এটাই স্বাভাবিক এবং তিনি সচেষ্ট হবেন কিভাবে ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করা যায়। পক্ষান্তরে ক্রেতাসাধারণের এ অধিকার আছে যে, তারা নিজেদের পছন্দমত পণ্যসামগ্রী ক্রয় করবে। তাই ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতা এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পণ্যসামগ্রী বা অন্য যে কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাসাধারণের ইচ্ছার স্বাধীনতা ইসলামী বাণিজ্যনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তত্ত্বগত বিশ্লেষণ হতে মনে হতে পারে যে, ধনতন্ত্রী অর্থনীতিতে ক্রেতারা তাদের পছন্দ এবং অপছন্দের ব্যাপারে তারা নিজের ইচ্ছামত পণ্য কিনতেও আবার না ও কিনতে পারে। আসলে কথাটা ঠিক নয়। এখানে ক্রেতার সার্বভৌমত্ব (স্বাধীনতা) কাল্পনিক। তত্ত্বে তাদের সার্বভৌমত্ব আছে বটে বাস্তবে নেই। বস্তুত সার্বভৌমত্ব আছে গুটি কয়েক ধনতন্ত্রী পুঁজিবাদীর। অর্থনীতি এমন জটিল এবং পেঁচানো বিষয় যে, আসল সার্বভৌমত্ব সাধারণ ক্রেতা

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হতে চলে যায় গুটি কয়েক পুঁজিপতি উৎপাদক, মজুদদার ব্যবসায়ী এবং শিল্প মালিকের হাতে।[১]

### সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ক্রেতা স্বাধীনতা

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ক্রেতার সার্বভৌমত্বের (ইচ্ছার স্বাধীনতা) কোন কথাই নেই। সমাজ সমষ্টিগতভাবে সার্বভৌম হতে পারে, কিন্তু নাগরিকরা ব্যক্তিগতভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করতে পারেনা। এ ব্যবস্থায় ক্রেতা তাদের সার্বভৌম অধিকার বিসর্জন দেয় বিশেষজ্ঞ এবং নীতি-নির্ধারক কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উপর।[২]

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ক্রেতার ইচ্ছার স্বাধীনতা নির্ধারিত হয় বিশেষজ্ঞ বিশেষের প্রজ্ঞা দ্বারা নয়, তা নির্ধারিত হয় কুরআন এবং সুন্নাহর সিদ্ধান্তের আলোকে এবং এতেই নিহিত রয়েছে ক্রতাসাধারণের সত্যিকারের কল্যাণ।

### ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ক্রেতার স্বাধীনতা

ক্রেতা স্বাধীনতার আরবী প্রতিশব্দ 'খিয়ার' (خيار)। এর শাব্দিক অর্থ ইখতিয়ার বা অধিকার। ইসলামী শরীয়তে ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখা বা না রাখার ইখতিয়ারকে শর্ত হিসেবে রাখা বৈধ। এই ইখতিয়ারকে ফিক্হ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'খিয়ার' বলা হয়।[৩]

### ক্রেতার স্বাধীনতার শ্রেণী বিভাগ

খিয়ার তথা ক্রেতার স্বাধীনতা প্রধানত তিন প্রকার[৪]। যথা-

১. খিয়ারুশ শর্ত (خيار الشرط)
২. খিয়ারুর রুয়াত (خيار الر وية)
৩. খিয়ারুল আয়েব (خيار العيب)

নিম্নে প্রত্যেক শ্রেণীর বিবরণ দেয়া হলো–

### খিয়ারুশ শর্ত (শর্তের ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার)

ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি তিনদিন কিংবা তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে বহাল রাখা বা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকার শর্ত করাকে খিয়ারুশ শর্ত বলা হয়।[৫]

---

১. এ.জেড.এম শামসুল আলম, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৫, পৃ. ৪৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৩. মাওলানা উবায়দুর হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১, খ. ৬, পৃ. ৯৭

৪. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, করাচীঃ মাকতাবাতুল বুশরা, ২০০৭, খ.৫, পৃ. ৩১

ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত চুক্তি বহাল রাখার অথবা বাতিল করার ইখতিয়ার শর্ত হিসাবে রাখা বৈধ এবং এই ইখতিয়ারকে খিয়ারুশ শর্ত (خيار الشرط) বলে।[৬]

কেনা-বেচার মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য খিয়ারুশ শর্ত জায়েয। আর তাদের উভয়ের জন্য তিনদিন অথবা তিন দিনের কম সময়ের জন্য স্বাধীনতা থাকবে। এ ব্যাপারে দলীল হল ঐ হাদীস যা বর্ণিত হয়েছে মুনকিজ ইবনে্ আমর আনসারী র. বেচা-কেনায় প্রতারিত হতেন। তখন নবী করীম স. তাকে বললেন, "যখন তুমি বেচা-কেনা করবে, তখন তুমি বলবে, আমাকে ধোঁকা দিবে না আর আমার জন্য তিন দিনের খিয়ার থাকবে"।[৭]

ক্রেতা যদি মাল কেনার সময় বলে, একদিন, দুইদিন বা তিন দিন আমাকে সময় দিন, আমি চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করে ঠিক করবো এ বস্তু ক্রয় করব কিনা। এরূপ শর্ত করা জায়েয আছে। যে কয়দিনের কথা বলেছে, সে কয়দিনের মধ্যে তার অধিকার আছে, সে নিতেও পারবে, আবার ফেরত দিতেও পারবে। এই সময়ে বিক্রেতা অন্যের নিকট উক্ত মাল বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু যদি ক্রেতা তিন দিন সময় চায় এবং টাকা দিয়ে অথবা দেয়ার ওয়াদা করে ক্রয়কৃত বস্তু নিয়ে যায়, অতঃপর তিন দিনের মধ্যে কোন জবাব না দিলে ক্রেতার আর ক্রয়কৃত বস্তু ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না। হ্যাঁ বিক্রেতা যদি স্বেচ্ছায় ফেরত নেয়, তবে তা তার অনুগ্রহ, তার অসম্মতিতে ফেরত দিতে পারবে না। তিন দিনের বেশি শর্ত করা জায়েয নেই। চার-পাঁচ দিনের শর্ত করলেও তিন দিনের মধ্যে মাল ফেরত দিলে ফেরত হয়ে যাবে। আর যদি ক্রেতা বলে, আমি ক্রয়কৃত বস্তু নিলাম তবে বায়' সহীহ হবে। তিন দিনের মধ্যে কিছু না বলে থাকলে বা কিছু না করে থাকলে বায়' ফাছেদ হয়ে যাবে।[৮]

---

৫. প্রাগুক্ত

৬. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী-আইন*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, খ.১, তৃতীয় ভাগ, পৃ. ৭০২

৭. ইমাম আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজীদ ইব্‌ন মাজাহ্, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ........... অনুচ্ছেদ : আল-হিজর আলা ইউকছিদু মালাহু, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০৩

عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لـــه فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضـــيت فأمـــسك وإن سخطت فارددها على صاحبها

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, অনুঃ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, *বেহেশ্‌তী জেওর*, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৮, খ.৫, পৃ. ১০৯

ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, খিয়ারুশ শর্তের জন্য তিন দিনের অধিক সময়সীমার জন্য শর্ত করা বৈধ। দলীল ইবনে উমর র. বর্ণিত হাদীস[৯]। তিনি দুই মাস পর্যন্ত খিয়ার জায়েয বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে চিন্তা-ভাবনার জন্য খিয়ার অনুমোদিত হয়েছে। আর এই ক্ষতি দমনের জন্য কোন কোন সময় তিন দিনের অধিক সময় প্রয়োজন হয়। এটা এরূপ হল যেমন-মূল্য আদায়ের ব্যাপারে সময়ের সুযোগ প্রদান করা।

ইমাম আবু হানীফা র.-এর দলীল এই, খিয়ারুশ শর্ত বেচা-কেনার চাহিদার বিপরীত। বেচা-কেনার চাহিদা হল বেচা-কেনা আবশ্যক হওয়া। তবে উক্ত খিয়ার কিয়াসের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও পূর্বোক্ত হাদীসের আলোকে জায়েয বলা হয়েছে। সুতরাং খিয়ারুশ শর্ত ঐ মুদ্দতের উপর সীমাবদ্ধ হবে যা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিন দিনের অধিক সময় নিষিদ্ধ হবে।[১০]

### খিয়ারুশ শর্তের পদ্ধতি

**খিয়ারুশ শর্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য অথবা ক্রেতা-বিক্রেতার কোন একজনের জন্য অথবা ক্রেতা-বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কারো জন্য হতে পারে। এর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।[১১] যেমন-**

১. ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য খিয়ার লাভের প্রথম পদ্ধতি হল এই, উভয়ের একজন বলল, আমি এ জিনিস এত মূল্যে আপনার নিকট বিক্রয় করছি। তবে শর্ত হল, তিনদিন পর্যন্ত আমার জন্য এই বিক্রি হতে ফিরে আসার ইখতিয়ার থাকবে। আর দ্বিতীয় জন অর্থাৎ ক্রেতা বলবে, আমি এ শর্তে ক্রয় করলাম, তিনদিন পর্যন্ত আপনার ইখতিয়ার থাকবে। এই অবস্থায় এ শর্ত উভয় পক্ষের হতে হবে।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, প্রথমে একপক্ষ শর্ত করবে এবং অপরপক্ষ বলবে, আমি ক্রয় করলাম। সে শর্তের কথা উল্লেখ বা উচ্চারণ করবে না।

৩. তৃতীয় পদ্ধতি হল, ক্রেতা-বিক্রেতা বা তাদের কোন একজন তৃতীয় কোন ব্যক্তির পছন্দ করার শর্তারোপ করেছে। যেমন তাদের একজন বলল, আমি এ মাল এত টাকায় বিক্রয় করছি, তবে যদি আমার পিতা পছন্দ করে।

---

৯. আবূ 'আব্দুর রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ........ মদীনা মুনাওয়ারা : আল-মাকতাবা আল-শামেলা, অনুচ্ছেদ : যুকেরাল ইখতিলাফ 'আলা নাফে' ফী লাফযিন, (المكتبة الشاملة)

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

১০. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

ক্রেতা তিন দিনের সময় নিল এবং বলল, আমার মাতার পছন্দ হলে ক্রয়কৃত বস্ত্র রাখব আর না হলে ফেরত দিব। এরূপ করা জায়েয আছে। ক্রেতা দুই কিংবা তিনটি জিনিস ক্রয়শেষে বলল, তিনদিন পর্যন্ত আমার ইখতিয়ারে থাকবে, যদি পছন্দ হয় তবে একটি দশ টাকায় কিনব। এরূপ তিনটি জিনিসের যে কোন একটি তিন দিনের মধ্যে পছন্দ করে নেয়া জায়েয। তবে তিনটির অধিক হলে জায়েয হবে না। তিনদিনের মধ্যে একটিও ফেরত না দিলে তিনটি জিনিসই রাখতে হবে। তিনটির বেশি নিলে বায়' ফাসেদ হবে। ক্রেতা একটি জিনিস তিনদিনের শর্তে বাড়ীতে নিয়ে যদি ব্যবহার করে তবে তা ফেরত দিতে পারবে না। অবশ্য এই ব্যবহার যদি শুধু দেখার জন্য হয়, যেমন একবার শুধু পরিধান করে দেখল যে, ঠিক হয় কিনা, এমতাবস্থায় ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে।[১২]

চুক্তির ক্ষেত্রে যে পক্ষকে চুক্তি বাতিল করা বা বহাল রাখার ইখতিয়ার দেয়া হয় সেই পক্ষ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে স্বীয় ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে। ইখতিয়ার অর্জনকারী পক্ষ কথায় বা কাজের মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করতে পারবে। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং তদনুযায়ী কাজ করা বাধ্যতামূলক হবে। বিক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করার ইখতিয়ার প্রদান করা হলে এবং চুক্তিপত্রে উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে সে মারা গেলে ক্রেতা বিক্রীত মালের মালিক হবে এবং উপরোক্ত ইখতিয়ার বিক্রেতার ওয়ারিসগণের অনুকূলে বর্তাবে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই ইখতিয়ার প্রদান করা হলে–যে কোন পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং একপক্ষ চুক্তি বহালের কথা ব্যক্ত করলে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং অপর পক্ষের ইখতিয়ার বহাল থাকবে।[১৩]

ক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখার বা তা বাতিল করার ইখতিয়ার অর্জন করে এবং বিক্রেতার নিকট হতে ক্রয়কৃত বস্ত্র হস্তগত করার পর পুনরায় তা ফেরত দেয় আর বিক্রেতা বলে, আমি তোমাকে যে মাল দিয়েছি এটা সে মাল নয়। এ ক্ষেত্রে ক্রেতাকে শপথ করতে হবে। সে যদি শপথ করে বলে, এটাই সে মাল, তা হলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। বিক্রেতার দখলে থাকা বস্ত্র ক্রেতা গ্রহণ করার সময় বলল, এটি সে মাল নয় যা তুমি আমার নিকট বিক্রয় করেছ। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে ক্রেতা তাকে প্রদত্ত ইখতিয়ারের সুযোগ গ্রহণ করে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করতে পারবে। কেবল বিক্রেতার জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ইখতিয়ার রাখা হলে এবং ক্রেতা কর্তৃক মাল হস্তগত করার পর তা পুনরায় ফেরত দিলে অথবা বিক্রেতার নিকট থেকে মাল গ্রহণের সময় তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি

---

১২. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
১৩. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৩

হলে উভয় অবস্থায় শপথ সাপেক্ষে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য বিক্রেতা তাকে প্রদত্ত ইখতিয়ারের সুযোগ গ্রহণ করে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করতে পারবে।[১৪]

**খিয়ারুর রুয়াত (বিক্রিত মাল দেখার পর তা রাখা না রাখার অধিকার)**

ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনকালে ক্রেতা যদি মাল দেখে না থাকে এমতাবস্থায় উক্ত বেচা-কেনা জায়েয হবে, তবে মাল দেখার পর সে চুক্তি বহালও রাখতে পারে আবার বাতিলও করতে পারে, ক্রেতার এ ইখতিয়ারকে খিয়ারুর রুয়াত (পরিদর্শনের ইখতিয়ার) বলে।[১৫]

**খিয়ারুর রুয়াত ও এর হুকুম**

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও আহমাদ র.-এর মতে, কোন জিনিস না দেখে ক্রয় করা জায়েয, আর দেখার পর ক্রেতার এ অধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করবে অথবা গ্রহণ করবে না, যদিও সে দেখার পূর্বে সম্মত হয়েছিল। ইমাম শাফেঈ র.-এর মতে না দেখে কোন বস্তু ক্রয় করলে বেচা-কেনা বাতিল হয়ে যায়।[১৬] ইমাম শাফেঈ র.-এর বুদ্ধিভিত্তিক দলীল এই, না দেখে বেচা-কেনার বস্তু অজ্ঞাত। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তু অজ্ঞাত থাকবে।[১৭]

যে ব্যক্তি কোন বস্তু না দেখে ক্রয় করল, তার এ ধরনের কেনা কাটা জায়েয হবে তবে যখন সে বস্তুটি দেখবে, তখন তার জন্য খিয়ার হবে। ইচ্ছা করলে সে পূর্ণ দামে বস্তুটি গ্রহণ করবে, অন্যথায় ফেরত দিবে। ইমাম শাফেঈ র. বলেন, না দেখে বেচা-কেনা সম্পূর্ণ রূপে অশুদ্ধ হবে। কেননা এখানে বিক্রিত বস্তুটি অজ্ঞাত।[১৮]

না দেখে জিনিস ক্রয় করা জায়েয আছে কিন্তু দেখার পর ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, যদি পছন্দ হয় তবে নিবে আর অপছন্দ না হলে ফেরত দেয়ার অধিকার ক্রেতার থাকবে। জিনিসের কোন ত্রুটি থাকলেও শুধু দেখে রাখা রাখার অধিকার ক্রেতার থাকবে। উক্ত বিক্রেতা যদি কোন জিনিস না দেখে বিক্রি করে থাকে, তবে ক্রেতাকে জিনিস দেখাতে বাধ্য থাকবে। দেখার পর ইখতিয়ার থাকবে কেবল ক্রেতার, বিক্রেতার নয়।

---

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৭০৪
১৫. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
১৬. আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : মদীনা মোনাওয়ারা : আল-মাকাতাবা আল শামেলাহ, অনুচ্ছেদ : ফী বায়' আল-গারার, হাদীস নং- ২৯৩২ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
১৭. বুরহানুদ্দীন আল-মুরগিনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

ধান, চাল, গম, মটর ও সুপারি ইত্যাদি, যে সব জিনিস নমুনা দেখিয়ে বিক্রয় করা হয় সেগুলো নমুনার বিপরীত হওয়া উচিত নয়। এ ধরনের জিনিস যদি ক্রেতা সরল বিশ্বাসে শুধু উপরে দেখে ক্রয় করে, আর উপরে-নীচে একই রকম মাল নমুনা মোতাবেক পাওয়া যায়, তবে বেচা-কেনা শুদ্ধ হবে এবং ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না। কিন্তু যদি নীচে নমুনার বিপরীত মাল পাওয়া যায়, তবে ঐ সম্পূর্ণ মাল ফেরত দেয়ার অধিকার ক্রেতার থাকবে।[১৯]

যেসব জিনিস সাধারণত উক্ত রকম হয় না, ছোট-বড় হয় সেসব জিনিস শুধু উপরে দেখানো উচিত নয়। উপরে-নীচে ভালরূপে দেখে ক্রয় করবে। উপরে-নীচে ভালমত না দেখা পর্যন্ত খিয়ারুর রুয়াত বহাল থাকবে অর্থাৎ দেখে পছন্দ না হলে ফেরত দিতে পারবে। উপরে-নীচে ভালরূপে দেখে ক্রয় করলে ফেরত দিতে পারবে না। পানাহারের জিনিস যা পরীক্ষা করে দেখতে হয় তা শুধু দেখে ক্রয় করলে ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার থাকবে। অনেক দিন আগে একটি জিনিস দেখেছিল, এখন তা খরিদ করল, কিন্তু এসময় দেখেনি। ঘরে নিয়ে দেখল পূর্বে যেরূপ দেখেছিল ঠিক সেরূপ আছে। এখন দেখার পর ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু অনেক দিন পর কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকলে নেয়া না নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে।[২০]

সম্পদ স্থাবর প্রকৃতির হলে তার সমগ্র অংশ দেখা প্রয়োজন, তবে সমগ্র অংশ একই রকম হলে তার একটি অংশ পরিদর্শনই যথেষ্ট। একই চুক্তির অধীনে বিভিন্ন ধরনের মাল ক্রয় করলে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ধরনের মাল পরিদর্শন করা আবশ্যক।[২১]

অন্ধ ব্যক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে, তবে কোন সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তার মান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকলে সে চুক্তি বহালও রাখতে পারে আবার বাতিলও করতে পারে। ক্রেতার নিয়োগকৃত প্রতিনিধির পরিদর্শন ক্রেতার পরিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে। মাল পরিদর্শন করে চুক্তি সম্পাদনের পর ক্রেতা কর্তৃক মাল হস্তগত করার পূর্বে বিক্রেতা কর্তৃক তার পরিবর্তন করা হলে, ক্রেতা চুক্তি বহালও রাখতে পারে অথবা বাতিলও করতে পারে। ক্রেতার এমন আচরণ যা দ্বারা সে মালের মালিকানা লাভ করেছে এরূপ বুঝায়, সে ক্ষেত্রে তার খিয়ারুর রুয়াত বাতিল হয়ে যাবে। খিয়ারুর রুয়াত শুধু এমন চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।[২২]

---

[১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[২০]. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১

[২১]. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৮

[২২]. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৬০

ক্রেতার মৃত্যু ঘটলে খিয়ারুর রুয়াত বাতিল বলে গণ্য হবে। খিয়ারুর রুয়াত ওয়ারিসগণের অনুকূলে বর্তায় না। ক্রেতার হাতে মাল নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে অথবা এমন ত্রুটিযুক্ত হলে যার দ্বারা মালটি ফেরত দেয়া সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতার রুয়াত বাতিল হয়ে যাবে। ক্রয়কৃত মাল ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পর তার মধ্যে এমন কোন প্রকারের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধন করা হল যার দ্বারা উক্ত মাল বিক্রেতার নিকট ফেরত দেয়া সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে খিয়ারুর রুয়াত বাতিল হয়ে যাবে।[২৩]

**খিয়ারুল আয়েব (ত্রুটিযুক্ত মাল গ্রহণ না করার অধিকার)**

ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত মালের মধ্যে এমন ত্রুটি দেখতে পায় যার কারণে এর নির্ধারিত মূল্য হ্রাস পেয়ে যায়, এমতাবস্থায় ক্রেতা চুক্তি বহাল রাখতে পারে এবং বাতিলও করতে পারে। এই ইখতিয়ারকে ফিক্‌হের পরিভাষায় 'খিয়ারুল আয়েব' বলে।[২৪]

চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলেও মালের ত্রুটিমুক্ত হওয়া শর্ত হিসাবে গণ্য হবে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালের ত্রুটি সত্ত্বেও চুক্তি বহাল রাখলে ক্রেতাকে মালের নির্ধারিত মূল্যই পরিশোধ করতে হবে এবং সে মূল্য হ্রাসের জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করতে পারবে না। এমন কোন 'দোষ' যার ফলে পণ্য বিশেষজ্ঞের মতে পণ্যের মূল্য হ্রাস পায় তা 'ত্রুটি' হিসাবে গণ্য হবে। মাল বিক্রয়ের পর এবং বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় তাতে কোন দোষ সৃষ্টি হলে বা দেখা দিলে তা ত্রুটি হিসাবে গণ্য হবে এবং ক্রেতার ইখতিয়ার বহাল থাকবে। বিক্রেতা ক্রেতাকে মালের ত্রুটি দেখিয়ে বিক্রয় করলে এবং ক্রেতা তা গ্রহণ করলে তার ইখতিয়ার থাকবে না।[২৫]

'আয়েব' এর বর্ণনায় হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, ব্যবসায়ীদের রীতিনীতিতে যে সকল বিষয় পণ্যের মূল্য কমিয়ে দেয় তা-ই আয়েব বা বস্তুর দোষ। কেননা মূলধনের মধ্যে ত্রুটি হওয়ার কারণেই ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এটি মূল্য কমে যাওয়ার কারণে হয় এবং তা জানার উপায় হচ্ছে ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের রীতিনীতি।[২৬]

এক থান কাপড় কেনার পর দেখা গেল, তার কোন কোনটিতে ছিদ্র আছে বা তাতে অন্য কোন দোষ রয়েছে তখন ক্রেতার ঐ কাপড় ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নেয়ার অধিকার থাকবে। আর পুরো দাম দিয়ে তা রাখতে চাইলে রাখতে পারবে। কিন্তু দোষের কারণে দাম কম দিতে পারবে না। তবে দোষ বের হবার কারণে বিক্রেতা যদি কিছু দাম কম নেয়, সে তা পারবে। ক্রেতা কাপড় কিনে আনার পর শিশুরা তার

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

২৪. মাওলানা উবায়দুর হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

২৫. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৫

২৬. বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

এককোনা ছিঁড়ে ফেলল কিংবা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলল, তারপর দেখা গেল কাপড়ে পূর্বের দোষ আরোও আছে, এমতবস্থায় ক্রেতা উক্ত কাপড় ফেরত দিতে পারবে না। কারণ কাপড়ে পুরাতন দোষ ছাড়া নতুন দোষও ঘটেছে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা ঐকমত্যের ভিত্তিতে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সালিস নিযুক্ত করবে.সে যে দাম বলবে ক্রেতা সেই দাম দিবে। ক্রেতা জামার কাপড় কিনে দর্জির দ্বারা কাটাবার পর কাপড়ের দোষ বের হলে তখন তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না।[২৭]

এক টাকায় পনের সের গম অথবা দেড় সের ঘি ক্রয় করে দেখা গেল, এর কিছু ভাল এবং কিছু খারাপ। এমতাবস্থায় ক্রেতার জন্য ভালগুলো বেছে নেয়া ও খারাপগুলো ফেরত দেয়া জায়েয নয়। ভাল-মন্দ সবই নিবে। আর না নিলে সবই ফেরত দিবে। হ্যাঁ, তবে বিক্রেতা যদি বলে, বেছে ভালগুলো নিয়ে যাও এবং মন্দগুলো রেখে যাও, তবে ক্রেতার জন্য তা নেয়া জায়েয হবে। বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া জায়েয হবে না। ক্রেতা বকরীর গোশত ক্রয় করে দেখল তা বকরীর গোশত নয়; বরং ভেড়ার গোশত, তবে ক্রেতা গোশত ফেরত দিতে পারবে।[২৮]

পণ্যের মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়লে ত্রুটিজনিত কারণে পণ্য ফেরত দেয়ার অধিকার ক্রেতার ততক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না বুঝা যায় যে, সে ঐ ত্রুটিজনিত মালই রাখতে রাযী আছে। যদি তার কাজ দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ঐ ত্রুটিসহ মাল রাখতে রাযী আছে, তবে তারপর আর মাল ফেরত দেয়ার অধিকার তার থাকবে না। যেমন, একজন ক্রেতা একটি গাভী বা বকরী ক্রয় করল। বাড়ী এনে ত্রুটি দেখা সত্ত্বেও যদি বলে যে, এই ত্রুটিসহই আমি এই গাভী রাখব, তবে তার ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। যদি মুখে না বলে এমন কাজ করে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ঐ ত্রুটিসহ মাল রাখবে, যেমন হয়তো গাভীর গায়ে যখম ছিল, সে ঐ যখমের চিকিৎসা করা শুরু করে দিল, তবে আর সে গাভী ফেরত দেয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে না। অবশ্য যদি বিক্রেতা নিজে ইচ্ছা করে ফেরত নেয় তা ভিন্ন কথা।[২৯]

মালের মধ্যে 'ত্রুটি আছে' তা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ক্রেতার এমন আচরণ যা দ্বারা সে মালের মালিকানা পেয়েছে এরূপ বুঝায়, সে ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। পণ্য ক্রয়ের সময় যদি ক্রেতা বলে যে, "মালটি যে কোন ত্রুটিসহ গ্রহণ করা হল" তবে তার ইখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে।[৩০]

---

২৭. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

২৯. মাওলানা উবায়দুর হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৩০. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৫

বিক্রেতা বিক্রয় করার সময় ক্রেতাকে বলে দিল, দেখে নিন। পরে কোন ত্রুটি দেখা দিলে আমি তার জন্য দায়ী নই। একথা বলা সত্ত্বেও, ক্রেতা ক্রয় করে নিল। পরে যদি কোন ত্রুটি বের হয়, তবে ক্রেতার মাল ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না।[৩১]

**খিয়ারের অন্যান্য প্রকার**

উপরিউক্ত তিনটি শ্রেণী ছাড়াও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল গ্রন্থে খিয়ারের আরো পনেরটি শ্রেণী উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলোর বিবরণ দেয়া হল

১. **খিয়ারুল ইসতিহকাক** (خيار الاستحقاق) : যদি ক্রয়কৃত বস্তুর অন্য কোন মালিক বের হয়ে আসে এবং তা মালামাল হস্তগত করার আগে হয় তবে এই সমুদয় মালামাল গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি মালামাল হস্তগত করার পর এমনটি ঘটে তবে যাওয়াতুল কিয়াম যথা গরু, ছাগল, মেষ ভেড়া ইত্যাদি বস্তুর ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার থাকবে কিন্তু যাওয়াতুল আমসাল যথা, ধান, চাল, গম, ডাল ইত্যাদি বস্তুর ক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকবে না। এ ইখতিয়ারকে 'খিয়ারুল ইসতিহকাক' বলে।

২. **খিয়ারুত তাগরীর আল-ফি'লী** (خيار التغرير الفعلى): যেমন গাভীর স্তনে দুধ জমিয়ে রেখে পরে তা বিক্রি করা। এরূপ করার পেছনে বিক্রেতার উদ্দেশ্য হলো ক্রেতাকে এ কথা বুঝানো যে, এটি অনেক দুধের গাভী এবং এভাবে তার থেকে অধিক মূল্য লাভ করা। এরূপ ধোঁকা খেয়ে কেউ যদি কোন গাভী ক্রয় করে তবে ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে এটি রাখতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে ফেরতও দিতে পারবে। একেই 'খিয়ারুত তাগরীর আল-ফি'লী' বলা হয়। অবশ্য এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ র. ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে এ জাতীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার কোনরূপ ইখতিয়ার থাকবে না। তবে সে বিক্রেতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে।

৩. **খিয়ারুত তা'য়ীন** (خيار التعيين) : দুই বা ততোধিক জিনিসের মূল্য স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করে বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে এর মধ্য হতে তার পছন্দমত কোন এক বা একাধিক জিনিস বাছাই করে নেয়ার ইচ্ছা প্রদান করাকে 'খিয়ারুত তা'য়ীন' বলা হয়। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের এটি একটি বহুল প্রচলিত রীতি যে, ক্রেতাকে একাধিক পণ্যসামগ্রী দিয়ে তার মধ্যে হতে পছন্দের পণ্যটি গ্রহণ করে অন্যগুলো ফেরত দেয়ার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ইসলামী বাণিজ্যনীতিতে ক্রেতা সাধারণের এ ধরণের স্বাধীনতা স্বীকৃত।

---

৩১. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, প্রাগুক্ত পৃ ১১৩

৪. **খিয়ারুল গাবান** (خيار الغبن): ক্রেতা যদি বিক্রেতার সাথে চরম ঠকবাজি করে বা বিক্রেতা ক্রেতার সাথে প্রতারণা করে অথবা দালাল তাদের কোন একজনের সাথে প্রতারণা করে তবে যার সাথে ঠকবাজি করা হয়েছে তার ইখতিয়ার থাকবে। এ ধরনের ইখতিয়ারকে 'খিয়ারুল গাবান' বলা হয়। এ ধরনের লেনদেনে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। আর যদি বিক্রেতা তার বিক্রিত মাল স্বেচ্ছায় ফেরত গ্রহণে রাজী হয় তখন ক্রেতার অধিকার থাকবে মালটি গ্রহণ করার অথবা ফেরত দেয়ার।[৩২] তবে বিক্রয় করার সময় পণ্যের মাঝে যদি কোন প্রকার দোষ পাওয়া যায় তবে তা প্রকাশ করে দেয়া বিক্রেতার উপর অবশ্য কর্তব্য। দোষের কথা না বলে ধোঁকা দিয়ে মাল চালিয়ে দেয়া বৈধ নয়।

৫. **আল-খিয়ার ফী তাফরীকিস সাফাকা** (الخيار فى تفريق الصفقة): মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে যদি এর কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায় তখন যে ইখতিয়ার হাসিল হয় তাকে 'আল-খিয়ার ফী তাফরীকিস সাফাকা' বলা হয়।

৬. **আল-খিয়ার ফী খিয়ানাতিত তাওলিয়া** (الخيار فى خيانة التولية): তাওলিয়া অর্থাৎ বিনা লাভে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতার পক্ষ হতে খিয়ানত প্রকাশ পায়-চাই তা তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হোক বা দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হোক কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রমাণিত হোক, এ অবস্থায় ক্রেতা ইচ্ছা করলে এ মাল ফেরত দিতে পারবে আর ইচ্ছা করলে খিয়ানত পরিমাণ মূল্য কমিয়ে দিয়ে তা রেখে দিবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে রাযী থাকতে হবে। এ জাতীয় ইখতিয়ারকে 'আল-খিয়ার ফী খিয়ানাতিত তাওলিয়া' বলা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ক্রেতার অধিকার থাকবে নষ্ট হয়ে যাওয়া মালের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কিংবা যতটুকু পরিমাণ মালামাল নষ্ট হয়েছে ততটুকু নতুনভাবে পাওয়ার। তবে এ ধরনের লেনদেনের চুক্তিতে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট থাকা উচিত।

৭. **আল-খিয়ার ফী খিয়ানাতিল মুরাবাহা** (الخيار فى خيانة المرابحة): মুরাবাহা অর্থাৎ লাভে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার খিয়ানত প্রকাশ পাওয়া। চাই তা তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হোক বা দলিলের দ্বারা প্রমাণিত হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে প্রমাণিত হোক। এরূপ অবস্থায় ক্রেতা ইচ্ছা করলে ঐ পণ্য পূর্ণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে অথবা তা ফেরত দিবে। এ জাতীয় ইখতিয়ারকে 'আল-খিয়ার ফী খিয়ানাতিল মুরাবাহা' বলা হয়।

---

[৩২]. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

এ জাতীয় লেনদেনে ক্রেতাকে অগ্রিম কোন জামানত অথবা মূল্যের কোন অংশ বিক্রেতাকে দিতে হয় না, শুধু চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় বা সম্মত থাকতে হয়। ফলে ক্রেতার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে পণ্যটি গ্রহণ করা বা না করার। তবে ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যটি কিনতে অপারগ হয় তাহলে বিক্রেতা তা অন্যের কাছে বিক্রয় করে দিতে পারে।[৩৩]

৮. **আল-খিয়ার ফী যুহুরিল মাবীয়ে মারহুনান** (الخيار في ظهور المبيع مرهونا): কোন বাড়ি বা ঘর ক্রয় করার পর এ কথা প্রকাশ হলো যে, এটি বন্ধকের বাড়ি বা ঘর। তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে আক্‌দকে বহাল কিংবা বাতিল করার। এই ইখতিয়ারকে 'আল-খিয়ার ফী যুহুরিল মাবীয়ে মারহুনান' বলা হয়। হানাফী মাযহাব মতে, বন্ধকী দ্রব্য গ্রহীতার হাতে যিম্মাস্বরূপ থাকে। এর নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তার। এমতাবস্থায় সে উক্ত সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে না।[৩৪] এমতাবস্থায় ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য প্রত্যাহার করার।

৯. **আল-খিয়ার ফী যুহুরিল মাবীয়ে মুসতাজীরান** (الخيار في ظهور المبيع مستجيرا): কেউ কোন বাড়ি ক্রয় করার পর যদি একথা প্রকাশ পায় যে, বাড়িটি ভাড়া দেয়া আছে, তবে এ ক্ষেত্রেও তার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে এ আক্‌দ বহাল রাখতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে বাতিলও করতে পারবে। একে পরিভাষায় 'আল-খিয়ার ফী যুহুরিল মাবীয়ে মুসতাজীরান' বলা হয়। আক্‌দ বহাল রাখলে ভাড়ার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ক্রেতা বাড়িটির মালিক হবে। কেননা মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভাড়া বাতিল করার অধিকার থাকে না। তবে বাড়ির মালিক বাড়ি বিক্রির শর্ত যুক্ত করে ভাড়া দিলে তা ভিন্ন কথা।[৩৫]

১০. **আল-খিয়ার ফী আকদিল ফুযূলী** (الخيار في عقد الفضولي): মালিক বা মূল ক্রেতার অনুমতি ব্যতিরেকে তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি কোন আক্‌দ সম্পাদন করে তবে মালিক বা মূল ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে অনুমতি দিতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে অনুমতিদান থেকে বিরত থাকতে পারবে। একে 'আল-খিয়ার ফী আকদিল ফুযূলী' বলা হয়।

---

[৩৩]. মোঃ আবু তাহের, *ইসলামের অর্থনৈতিক ইতিহাস ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : চলক প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ৩০৩

[৩৪]. এ. বি. এম হোসাইন, *ইসলামের বাণিজ্য আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশনে বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ৩৯

[৩৫]. সম্পাদনা পরিষদ, *ব্যাবসা-বণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ. ৫৭

এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হল, ক্রেতা-বিক্রেতা যদি থাকে আর বিক্রিত বস্তু এবং মূল্যও যদি হুবহু হয় এবং যার মাল সেও যদি বিদ্যমান থাকে তবে মালিকের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।[৩৬]

১১. **আল-খিয়ার ফী ফাওয়াতি ওয়াসফিন মারগূবিন ফীহ** (الخيار في فوات وصف مرغوب فيه): বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা মালের যে মানের বর্ণনা দিয়েছে, হস্ত ান্তরের সময় মাল সেই গুণ বা মান অনুযায়ী না হলে ক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখার বা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে। ক্রেতাপণ্য রাখতে হলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করতে হবে। এ ইখতিয়ারকে 'আল-খিয়ার ফী ফাওয়াতি ওয়াসফিন মারগূবিন ফীহ্' বলা হয়। বিক্রিত দ্রব্যের গুণাগুণ ও সমস্ত বিবরণ ক্রেতাকে স্পষ্টকরে বলতে হবে। অন্যথায়, বিক্রয় সহীহ্ হবে না। বরং ক্রেতার অধিকার থাকবে তা ফেরত দেয়ার। কেননা দ্রব্যের দোষত্রুটি প্রকাশ না করে ধোঁকা দিয়ে বিক্রয় করা বৈধ নয়।[৩৭]

১২. **খিয়ারুল কবুল** (خيار القبول): ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কোন একজনের পক্ষ হতে ইজাব করার পর অপর জনের ইখতিয়ার থাকে। ইচ্ছা করলে সে ঐ মজলিসে তা কবুল করবে আবার ইচ্ছা করলে প্রত্যাখ্যানও করতে পারবে। এ ইখতিয়ারকে 'খিয়ারুল কবুল' বলা হয়। এক্ষেত্রে ফকীহগণের অভিমত হল, ক্রেতা ও বিক্রেতা একই মজলিসে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ মজলিস পরিবর্তনের আগেই তাদের কথা তথা ইজাব ও কবুল চূড়ান্ত করে নিতে হবে। প্রস্তাব কবুল করার পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতার কোন একজন মজলিস ত্যাগ করলে ইজাব বাতিল বলে গণ্য হবে।[৩৮]

১৩. **খিয়ারু কাশফিল হাল** (خيار كشف الحال): যেমন কেউ এমন পাত্র বা এমন বাটখারা দিয়ে কোন কিছু ক্রয় করল যার পরিমাণ তার জানা নেই তবে পাত্র বা বাটখারার পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তার ইখতিয়ার থাকবে। এই ইখতিয়ারকে 'খিয়ারু কাশফিল হাল' বলে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে সঠিক পরিমাণ জেনে নিয়ে ক্রয় করার। কেননা ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ শর্ত হল বিক্রিত পণ্যদ্রব্য এবং পণ্যমূল্য স্পষ্টভাবে জানা থাকা যাতে এ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাকে কোনরূপ বিবাদে লিপ্ত হতে না হয়। কাজেই অজ্ঞাত পরিমাণ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সঠিক নয়।[৩৯]

---

[৩৬]. সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, পৃ. ৭৫
[৩৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
[৩৮]. সম্পাদনা পরিষদ, *ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
[৩৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১৪. **খিয়ারুন নক্দ** (خيار النقد): ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে পণ্যের মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারিত থাকা অবস্থায় ঐ সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করলে বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখার অথবা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে। এই ইখতিয়ারকে 'খিয়ারুন নাক্দ' বলা হয়। তবে মূল্য পরিশোধের পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতার অনুমতি নিয়ে পণ্যের গ্রহণ করতে পারবে। অনুমতি ব্যতীত পণ্য হস্তগত করলে তা হস্তান্তর বলে গণ্য হবে না।[৪০]

১৫. **খিয়ারুল কাম্মিয়্যা** (خيار الكمية): যেমন কেউ বলল, এই মটকিতে যা কিছু আছে আমি তা ক্রয় করলাম। তারপর সে দেখল, এতে তেল বা অন্য কিছু আছে। এমতাবস্থায় ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে এ ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে বাতিলও করতে পারবে। এ জাতীয় ইখতিয়ারকে 'খিয়ারুল কাম্মিয়্যা' বলা হয়।[৪১]

অজ্ঞাত পরিমাণ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সহীহ নয়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ মূলনীতি এই যে, বিক্রিতব্য পণ্য এবং এর মূল্য যদি অজ্ঞাত থাকে এবং এতে পণ্য ও পণ্যমূল্য যদি হস্তান্তর করা সম্ভব না হয় তবে এ বেচাকেনা জায়েয হবে না। আর যদি এমনটি না হয় তবে এ বেচাকেনা জায়েয হবে।[৪২]

## উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, ইসলাম মানব জাতির সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে শাশ্বত ও যুগোপযোগী বিধান দিয়েছে ইসলামের নীতি তারই প্রতিচ্ছবি। এ নীতির অন্যতম দিক হল ক্রেতা বা ভোক্তার স্বাধীনতা। ক্রেতা বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত ক্রয় নিজের ইচ্ছামত করবে- এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আধুনিককালেও যখন বিভিন্ন দিক থেকে দাবি-দাওয়া পেশ করা হচ্ছে, সেখানে ইসলাম বহুকাল পূর্বেই তা আইনগত মর্যাদা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করে ইসলাম বিশ্ববাসীর কাছে তার উদার, গণমুখী ও সর্বজনীন নীতি-আদর্শের যথার্থতা প্রমাণ করেছে।

---

[৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
[৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৮০
[৪২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩০
এপ্রিল-জুন : ২০১২

# ভোক্তা অধিকারঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

এহতেশামুল হক*

*[সারসংক্ষেপ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী রাষ্ট্রের জনগণের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণের নিশ্চয়তা লাভকরা আমাদের একটি মৌলিক অধিকার। বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্য প্রয়োজন তেমনি সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য ভেজালবিহীন খাদ্য অপরিহার্য। মানুষ কেন খাদ্যে ভেজাল দেয় তার কারণ পর্যালোচনা করলে মানুষের লোভী মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে। অঢেল বিত্ত- বৈভব ও অর্থের লালসা অনেক সময় মানুষকে বিপথগামী করে। জীবন ধারণের সঙ্গে অর্থ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজ জীবনে স্বাভাবিকভাবে চলতে গেলে তথা বাঁচতে গেলে অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই অর্থের জন্য মানুষকে প্রাণান্তকর চেষ্টাও করতে হয়। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন আছে বলেই তা যে-কোনো উপায়ে উপার্জন করা হবে এমনটি কোনো আইন-বিধান সমর্থন করে না। আল-কুরআনসহ সকল ধর্ম গ্রন্থে সৎপথে জীবিকা উপার্জনের কথা বলা হলেও সর্বত্রই আজ দেখা যাচ্ছে উল্টো চিত্র। এ ক্ষেত্রে ভোক্তারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রবন্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ভেজাল সম্পর্কিত ইসলামের বিধানগুলো সংক্ষিপ্ত রূপে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের আলোকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের বর্তমান চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে নিয়োজিত বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের আইন পর্যালোচনাপূর্বক এর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলো সমাধানের জন্য কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করা।]*

**ভেজালের সংজ্ঞা ঃ** ভেজাল একটি বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দ। এর অর্থ হলোঃ নিকৃষ্ট, খাঁটি নয় এমন নিকৃষ্ট দ্রব্য মিশ্রণ, গণ্ডগোল, ঝামেলা, বিশৃঙ্খলা[১]। অন্যভাবে বলা যায়, ভেজাল বলতে নিকৃষ্ট পদার্থ মিশ্রিত, কৃত্রিম মেকি[২] কোন কিছু বুঝায়। ইংরেজীতে একে, Adulterant, contaminant, impurity, trouble,

---

* প্রভাষক, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. মোসলেম উদ্দিন, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫, পৃ. ৬৩৯

২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, কলকাতা সাহিত্য সংসদ, একবিংশতম মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃ. ৫৪৯

tangle, hitch, snag, spurious, corrupt[3]. প্রভৃতি শব্দে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নিকৃষ্ট পদার্থ যা উৎকৃষ্ট পদার্থের সাথে মিশানো হয় কিংবা নিকৃষ্ট পদার্থ মিশ্রিত খাঁটি বা বিশুদ্ধ নয় এমন যে কোনো বস্তুকে ভেজাল বলে[৪]। মহান আল্লাহ বলেন, "সে পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে।[৫] এ ভেজালের মহাসমারোহ চলছে বিশ্বব্যাপী নানা কৌশলে, মুখরোচক স্লোগানে ও অভিনব পদ্ধতিতে। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভেজালেরও বিভিন্ন রূপ লক্ষ করা যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে পরিচালিত ভেজাল বিরোধী অভিযানে ভেজালের যে বীভৎস চিত্র ধরা পড়েছে, তা দেশবাসীকে একদিকে হতবাক করেছে, অন্যদিকে জন্ম দিয়েছে হাজারো প্রশ্নের; তবে কি ভেজাল প্রতিরোধ করার জন্য কোনো আইন নেই? নাকি তার প্রয়োগের অভাব?

**ইসলামী দৃষ্টিতে ভেজাল**

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা[৬]। এতে মানুষের জন্য যা অকল্যাণকর ও নিকৃষ্ট সেসব বস্তু, পণ্য ও বিষয় হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে ভেজাল পণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং অবৈধ। নিম্নে ভেজাল সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো-

**ভেজাল মানবতা বিরোধী অপরাধ ঃ** পণ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রবণতার ফলে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য অস্বাস্থ্যকর ও বিভিন্ন রোগের নিয়ামক শক্তিরূপে পরিণত হয়। খাবার হতেই যেমন মানুষের রক্ত তৈরী হয় তেমনি তা হতেই রোগের উৎপত্তি ঘটতে পারে। ফলে এর বিষাক্ত ছোবলে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কুরআন মাজীদে এ ধরনের গুপ্ত হত্যাকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কর্ম করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল"।[৭] খাদ্য ও পণ্যে ভেজাল দেয়ার ফলে শুধু যে ব্যক্তি ভেজালদানের কাজে জড়িত ব্যক্তি অপরের ক্ষতিতে সচেষ্ট হয় তা-ই নয় বরং সে নিজেও অন্যের ভেজালে আচ্ছাদিত হয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কেননা সে তো এ সমাজেরই একজন সদস্য। মহান আল্লাহ এমন কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা

---

৩. *Bengali-English Dictionary*, Reprint edition, October-1994, Bangla Academy, P. 621

৪. শৈলেন্দ্রবিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

৫. আল-কুরআন, ৭:১৫৭

৬. আল-কুরআন, ৩:১৯

৭. আল-কুরআন, ৫:৩২

জারি করেছেন। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, "তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না"[৮]। এছাড়া এ মর্মে হাদীস এসেছে, "নিজের কিংবা অন্যের ক্ষয়ক্ষতি করা যাবে না"[৯]।

**মাপে বা ওজনে কম দেয়া অপরাধ :** কোনো কিছু ক্রয় করার ক্ষেত্রে একজন ক্রেতা বিশ্বস্ত বিক্রেতা অন্বেষণকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে যাতে তার ক্রয়কৃত পণ্যদ্রব্য ওজনে সঠিক, গুণগত মান সংরক্ষণ এবং সাশ্রয়ী হয়। পণ্য বিক্রয়ে মাপে বা ওজনে কম দেয়া এক প্রকার ধোঁকা। জাহেলী যুগে মুনাফাখোররা এ কাজ করতো। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা মাপ ও ওজনের কাজ ন্যায্যভাবে সুসম্পন্ন করবে। সাধ্যের অতীত কাজ করতে আমরা কাউকে বাধ্য করি না"।[১০] আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ঃ "তোমরা মাপার কাজ যখন করবে তখন পূর্ণ করে মাপবে। আর সুদৃঢ় দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করবে। এ নীতি অতীব কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই উত্তম ও ভাল"।[১১] এ মর্মে আরো বলা হয়েছে, "মাপে (ওজনে) যারা কম দেয় তাদের জন্য বড়ই দুঃখ। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয় তখন পুরাপুরি গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না যে, তারা যে কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে সেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে"।[১২] এবং "তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে, লোকদের জন্য ক্ষতিকারক হয়ো না। আর সঠিক পাল্লায় ওজন কর। লোকদের দ্রব্যাদি কম দিও না এবং পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করো না"।[১৩] রসূল স. বলেছেন, "কোন জিনিস বিক্রি করলে মেপে বিক্রি কর এবং কোন জিনিস ক্রয় করলে মেপে নাও"।[১৪] আর পণ্যে ভেজাল থাকলে তা বিক্রেতার প্রতি অবমাননা ও অবমূল্যায়ণ এবং প্রতারণার শামিল। এ মর্মে রসূল স. বলেন, "এর চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছুই নেই যে, তুমি এমন ব্যক্তির সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেবে যে তোমাকে বিশ্বাস করে"।[১৫] অন্য এক হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[১৬] সুতরাং ভেজাল ব্যবসায়ী ইসলামের গন্ডিবহির্ভূত বলে গণ্য হবে।

---

[৮]. আল-কুরআন, ৪: ২৯

[৯]. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম : মান বানা ফী হাক্কিহি মাইয়া দুররু বি-জারিহি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২৬১৭

[১০]. আল-কুরআন, ৬:১৫২

[১১]. আল-কুরআন, ১৭:৩৫

[১২]. আল-কুরআন, ১-৬

[১৩]. আল-কুরআন, ১৮৩

[১৪]. বুখারী, খন্ড ২, পৃঃ ৩৩৩

[১৫]. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফিল-মাআরীদ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৫৮৭

[১৬]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : মান গাশশানা ফা লাইছা মিন্না, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৬৯৫

**ভেজাল মিশ্রিত ব্যবসা করা অপরাধ ঃ** কোনো বিক্রেতার যদি তার পণ্যে ভেজাল মিশ্রণের প্রবণতা থাকে তাহলে সে পণ্যেরও মূল্য সাশ্রয় না করে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের ন্যায় তার মূল্য নির্ধারণ করে। এতে ক্রেতারা এক প্রকার জুলুমের শিকার হয়। এছাড়া এ ধরনের লেন-দেনে শঠতা, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির সম্ভাবনা থাকে। ফলে এটি অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণের শামিল। মহান আল্লাহ এ মর্মে বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না"।[১৭]

**ভেজাল ও ইসলামী নৈতিকতা :** মহান আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিতে দু'টি সত্তার মিলন ঘটিয়েছেন। একটি হল নৈতিক সত্তা অপরটি হল পাশবিক সত্তা- যার উপস্থিতি মানুষকে পশুতে পরিণত কর। অপরদিকে নৈতিক সত্তা মানুষকে প্রকৃত মানবে পরিণত করে। খাদ্য ও পণ্যদ্রব্যে ভেজালকারী নৈতিক গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আত্মস্বার্থ চিন্তা, অর্থলিপ্সা ও নোংরা মন-মানসিকতা মানুষের নৈতিকতাবোধ ও বিবেককে ধ্বংস করে দেয়। তার যাবতীয় চিন্তা-চেতনা মুনাফাখোরী, পুঁজিবাদী ও সুদের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ব্যবস্থার আবর্তে ঘূর্ণায়মান থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন"।[১৮] ইসলামের দৃষ্টিতে মুজদদারী জঘন্য অপরাধ। রসূল স. বলেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য মজুত করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না"।[১৯]

**ভাল পণ্যের সাথে নকল পণ্যের মিশ্রণ অপরাধ :** অধিক মুনাফা লাভের নেশায় নকল পণ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপন করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল স. একদা একটি খাদ্য স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপটির মধ্যে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে তাঁর হাত ভিজে গেল। রসূল স. বিক্রেতাকে বললেন, এটা কি হচ্ছে? সে বলল, এগুলোকে বৃষ্টিতে পেয়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কেন ভেজা অংশকে বাইরে রাখলে না, যাতে লোকেরা তা দেখে নিতে পারে। জেনে রেখ, যারা প্রতারণা করে, তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২০] আল্লাহ তাআলার নির্দেশ "তোমরা বাতিল উপায়ে পরস্পরের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করো না"।[২১]

## ভোক্তা অধিকারঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

**প্রাসঙ্গিক আইন ও সংশ্লিষ্ট ধারা :** ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ, ভোক্তা-অধিকার বিরোধ কার্য প্রতিরোধ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সমাধান করার জন্য ২০০৯ সালে

---

[১৭]. আল-কুরআন, ৪:২৯

[১৮]. আল-কুরআন, ২:২৭৬

[১৯]. ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ আহমাদ*, রিয়াদ : বায়তুল আকবার আদ-দাউলিয়া, ১৯৯৮, পৃ. ৪১০

[২০]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ু, অনুচ্ছেদ : মা জাআ কারাহিয়াতিল গাশশি ফিলবুয়ু, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৭৮৪

[২১]. আল-কুরআন, ৪:২৯

বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার এ পর্যন্ত অনেক আইন প্রণয়ন করেছে। অনেকগুলো আইনের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি আইনের নাম দেয়া হল-

| | আইন |
|---|---|
| ০১. | Banlgadesh Penal Code, 1860 |
| ০২. | Trademark Act, 2009 |
| ০৩. | Consumer Protection Act, 2009 |
| ০৪. | Standards of Weights and Measures Ordiance, 1982 |
| ০৫. | The Sale of Goodr Act, 1930 |
| ০৬. | The Control of Essential Copmmodities Act, 1956 |
| ০৭. | The Pure Food Ordinance, 1959 |
| ০৮. | The Essential Articles (Price control and anti-Hoarding) Act, 1953 |
| ০৯. | Drugs (Control) Ordinance, 1982 |
| ১০. | Breast-Milk substitute (Regulation of marketing) Ordinance, 1984 |
| ১১. | ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ |
| ১২. | The Animal Slaughter (Restriction) and Meat Control Act, 1957 |
| ১৪. | The Mobile Court Ordinance, 2007 |
| ১৫. | The Special Powers Act, 1974 |
| ১৬ | Drug Court |
| ১৭ | Food Court (Sepecial Court) |

**বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ :** বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ২৭২-২৭৬ পর্যন্ত ভোক্তার কিছু অধিকার সুনির্দিষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। এগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল-

**বিক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ :** ভেজাল খাদ্য কিংবা পানীয় বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারজাতকরণ ঃ ২৭২ ধারা অনুযায়ী "যদি কোন ব্যক্তি কোন

প্রকার খাদ্য বা পানীয় বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বা বিক্রি হবে জেনে ভেজাল মিশিয়ে সেটিকে খাবার বা পানের অযোগ্য করে বিক্রি করে কিংবা বিক্রি করার চেষ্টা করে তাহলে ঐ ব্যক্তি ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন"।[২২]

**ক্ষতিকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় :** ধারা ২৭৩ অনুযায়ী "কোন খাবার বা পানীয় অস্বাস্থ্যকার জেনে বা খাবারের অযোগ্য জেনেও যদি কেউ তা বিক্রি করে বা বিক্রি করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় তাহলে তিনি ছয় মাসের কারাদণ্ড বা অর্থ দণ্ড যা কিনা এক হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

**ভেষজ পদার্থে ভেজাল মেশান বা বিক্রয় করা :** ধারা ২৭৪ ও ২৭৫ অনুযায়ী "যদি কোনো ব্যক্তি চিকিৎসা দ্রব্য বা ঔষধের সাথে এমনভাবে ভেজাল মিশিয়ে দেয় যার ফলে ঐ ঔষধের গুণগত মান কমে যায় কিংবা তার কার্যক্ষমতা কমে যায় কিংবা সেটি অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে ঔষধটি ভাল হিসেবে বিক্রি করে কিংবা ব্যবহার করতে দেয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি ছয় মাসের কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থ দণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।[২৩]

---

[২২]. Section-272 of *Penal Code*: Adulteration of food or drink intended for sale.-Whoever adulterates any article of food or drink, so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both

[২৩]. Section-274 of *Penal Code* : Adulteration of drugs.--Whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficacy or change the operation of such drug or medical preparation, or to make it noxious, intending that it shall be sold or used for, or knowing it to be likely that it will be sold or used for, any medicinal purpose, as it had not undergone such adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Section-275 of *Penal Code* : Sale of adulterated drugs.--Whoever, knowing any drug or medical preparation to have been adulterated in such a manner as to lessen its efficacy, to change its operation, or to render it noxious, sells the same, or offers or exposes it for sale, or issues it from any dispensary for medicinal purposes as

**কোন ভেষজকে ভিন্নতর ভেষজ বা প্রস্তুত প্রক্রিয়া হিসাবে বিক্রয় করা**

ধারা ২৭৬ অনুযায়ী "যদি কেউ জানা সত্ত্বেও একটি ঔষধকে বা কোন একটি মেডিকেল সামগ্রীকে অন্য একটি ঔষধ বা মেডিকেল সামগ্রী হিসেবে বিক্রি করে কিংবা বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি ছয় মাসের কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন"।[২৪]

**ওজন এবং পরিমাণ সম্পর্কীয় ভেজাল এর দন্ড**

**ওজন দেয়ার ক্ষেত্রে অবৈধ সামগ্রীর ব্যবহার :** যদি কোন ব্যক্তি ওজন দেয়ার সময় ওজন বৃদ্ধির জন্য প্রতারণামূলক ভাবে কোন বস্তু ব্যবহার করে যা সে নিজে অবৈধ বলে জানে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন"।[২৫]

**প্রতারণামূলকভাবে মিথ্যা ওজন বা মাপ ব্যবহার করা**

২৬৫ ধারা অনুযায়ী "যদি কোন ব্যক্তি ওজন মাপার সময় অবৈধভাবে ভূয়া ওজন ব্যবহার করে কিংবা বস্তুর দৈর্ঘ্য বা ক্ষমতা সম্পর্কে অবৈধ পদ্ধতি অবলম্বন করে কিংবা যে ওজন ব্যবহার করার কথা সেটি ব্যবহার না করে অন্য একটি ওজন ব্যবহার করে,তাহলে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন"।[২৬]

---

unadulterated, or causes it to be used for medicinal purposes by any person not knowing of the adulteration, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

২৪. Section-276 of *Penal Code* : Sale of drug as a different drug or preparation.—Whoever knowingly sells, or offers or exposes for sale, or issues from a dispensary for medicinal purposes, any drug or medical preparation, as a different drug or medical preparation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

২৫. Section-264 of *Penal Code* : Fraudulent use of false instrument for weighing.–Whoever, fraudulently uses any instrument for weighing which he knows to be false, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

২৬. Section-265 of *Penal Code* : Fraudulent use of false weight or measure.--Whoever, fraudulently uses any false weight or false

### মিথ্যা ওজন কিংবা মাপ দেয়া

২৬৬ ধারা অনুযায়ী "যদি কারো অধিক্ষেত্রের মধ্যে ওজন দেয়ার জন্য কোনো উপাদান কিংবা কোন ওজন কিংবা এমন কোনো দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায় যা অবৈধ বলে সে জানে এবং প্রতারণামূলকভাবে সেটি ব্যবহার করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন"।[২৭]

### মিথ্যা বাটখারা বা মাপ তৈরি বা বিক্রয় করা

২৬৭ ধারা অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি ওজন দেয়ার কোনো সামগ্রী বা ওজন অবৈধ জানা সত্ত্বেও সেটি তৈরি, বিক্রি কিংবা বৈধ বলে ব্যবহার করে বা জানে যে এটি অবৈধভাবে বিক্রি হবে তাহলে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড কিংবা অর্থ দণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন"।[২৮]

### পণ্য বিক্রির জন্য বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ অফার

ব্যবসায় উন্নতির জন্য বা কোনো পণ্যদ্রব্যের বিক্রি বাড়াবার জন্য, ব্যবসায়ের উপর বা দ্রব্যের ক্রয়ের উপর লটারি করা বা লটারির প্রস্তাব প্রকাশ করা এই ধারায় অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি অনূর্ধ্ব ছয় মাস কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। মেলার সময় অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রি বৃদ্ধি করার জন্য লাকি কুপনের মাধ্যমে লটারির ব্যবস্থা করে। অনুরূপ লটারি এই ধারায় বেআইনী।

**Trade Mark Act 2009 :** ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ এর দশম অধ্যায়ে ভূয়া ট্রেডমার্ক ব্যবহার সম্পর্কিত অপরাধ ও দণ্ড আলোচনা করেছে। উক্ত আইনের ধারা

---

measure of length or capacity, or fraudulently uses any weight or any measure of length or capacity as a different weight or measure from what it is, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

২৭. Section-266 of *Penal Code*: Being in possession of false weight or measure.--Whoever is in possession of any instrument for weighing, or of any weight, or of any measure of length or capacity, which he knows to be false, intending that the same may be fraudulently used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

২৮. Section 267Making or selling false weight or measure.--Whoever makes, sells or disposes of any instrument for weighing, or any weight, or any measure of length or capacity which he knows to be false, in order that the same may be used as true, or knowing that the same is likely to be used as true, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

৭১-৭৪ অনুযায়ী যদি কোনো পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক মিথ্যাভাবে ব্যবহার করা হয় বা কোন ট্রেডমার্ক মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য ছাচ, ব্লক, মেশিন, প্লেট বা অন্য কোন যন্ত্র তৈরি করা হয়, কিংবা কোনো ট্রেডমার্ক এর প্রকৃত চিহ্ন বিকৃত বা পরিবর্তন করেন বা মুছে ফেলেন তাহলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লক্ষ কিন্তু অন্যূন ৫০ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং দ্বিতীয়বার বা পরবর্তী সময়ে একই দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ লক্ষ কিন্তু অন্যূন ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।[২৯]

**Standards of Weights and Measures Ordinance 1982 :** Standards of Weights and Measures Ordinance, ১৯৮২ এর ৫ম অংশ, ধারা ৩২-৫৪ ওজন এবং পরিমাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধের ও শাস্তির বিধান আলোচনা করেছে। উক্ত আইনের ৪নং ধারা আন্তর্জাতিক একক সিস্টেম (Unites of system international) প্রবর্তন করে পণ্য ওজন এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে-ক) ওজনের পরিমাপকের ক্ষেত্রে একক হবে কিলোগ্রাম।

ক) দৈর্ঘ্য পরিমাপকের একক হবে মিটার।
খ) সময় পরিমাপকের একক হবে সেকেন্ড।
গ) ইলেকট্রিক ইউনিট পরিমাপকের একক হবে অ্যাম্পিয়ার।
ঘ) তাপমাত্রা পরিমাপকের একক হবে কেলভিন।
ঙ) পদার্থ পরিমাপকের একক হবে মেল।

উপরিউক্ত আইন ভঙ্গকারীর সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা হতে পারে।

The Sale of Goods Act, 1930 & Doctrine of Caveat Emptor : The Sale of Goods Act, ১৯৩০ এর অধিকাংশ ধারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ধারা ১৬ তে উল্লেখিত Doctrine of Caveat Emptor। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, যে কোনো পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের সময় ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে সচেতন থেকে পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করতে হবে। এ মর্মে আরেকটি মতবাদের কথা বলতে হয় "Ignorence of law has no excuse" অর্থাৎ আইন জানি না এটি অপরাধ থেকে রেহাই পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন অজুহাত হতে পারে না। সুতরাং নিজের ভুলের জন্য কোনো অস্বাস্থ্যকর বা নষ্ট পণ্য ক্রয় করলে ক্রেতা সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না।[৩০]

---

[২৯]. ধারা ৭৩, *ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯*
[৩০]. আইনে শেষ বলে কোন কথা নেই। সুতরাং এই মতবাদের কিছু ব্যতিক্রমও আছে।

**The Control of Essential Commodities Act 1956 :** এ আইন অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের পণ্যকে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 'প্রয়োজনীয়' বলে ঘোষণা করতে পারে এবং অন্য যে কোনো পণ্যের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ আইনের আওতায় কিছু পণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান এবং মূল্য নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রির বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।[৩১] ধারা ৬ উক্ত আইন ভঙ্গকারীর জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি তিন বছর কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

**The Pure Food Ordinance, 1959 :** "পূর্ব পাকিস্তান বিশুদ্ধ খাদ্য সামগ্রী অধ্যাদেশ" নামে ১৯৫৯ সালে ৪ অক্টোবর তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। খাদ্যদ্রব্যের বিপণনে ভেজাল নিরোধ এবং মনুষ্যভোগ্য খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের উন্নতিকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত এই আইন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর "বাংলাদেশ বিশুদ্ধ খাদ্য সামগ্রী অধ্যাদেশ" নামে বলবৎ থাকে। এ আইনে কতিপয় খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন, বিক্রয়, বিশ্লেষণ, পরিদর্শন ও বাজেয়াপ্তকরণ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। এছাড়া ছোঁয়াচে বা অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত (ল্যাপরোসি, টিউবাকুলেসিস ইত্যাদি) ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য উৎপাদন বা বিক্রি এই আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩২] প্রথমবার এই আইন লঙ্ঘনের জন্য এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। দ্বিতীয়বার এর ক্ষেত্রে দোকান, কিংবা কারখানা বাজেয়াপ্তকরণসহ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা দুই লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

**The Essential Articles (Price Control and Anti-Hoarding) Act, 1953 :** অত্যাবশকীয় কিছু পণ্যের সরবরাহ, বিতরণ এবং মজুদ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৫৩ সালে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের অধীনে অত্যাবশকীয় পণ্য বলতে Control of Essential Commodities Act, 1956 এর ধারা ২ এ উল্লেখিত পণ্যসমূহকে বুঝাবো। ধারা ৩ অনুযায়ী সরকার বিভিন্ন সময়ে অত্যাবশকীয় কিছু পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন। যেমন- রমযানের সময় আমরা দেখেছি সরকার চিনির দাম নির্ধারণ এই আইনের অধীনে করে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করে তবে সে The Hoarding and Black Market Acঃ ১৯৪৮ এর ৩ নং ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করবে।

---

[৩১]. The Control of *Essential Commodities Act*, 1956 এর ৩ নং ধারা

[৩২]. Section 25 of *The Pure Food Ordinance*, 1959

**Drugs (Control) Ordinance, 1982 :** বিভিন্ন প্রকার ঔষধের প্রস্তুত, আমদানি-রপ্তানী এবং বিপণন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সালে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের অধীনে সরকার একটি (Durg Control Committee) গঠন করবে যা কিনা সব ধরনের ঔষধ, আমদানি-রপ্তানি, বিপণন বা বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করবে। Durg Control Committee অনুমতি ব্যতীত কোন ঔষধ কোম্পানী বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে না।[৩৩] এই আইনের ১৬নং ধারা অনুসারে নির্দিষ্ট কিছু ঔষধ প্রস্তুতকারক, আমদানিকারক এবং লাইসেন্স বিহীন ঔষধ বিক্রেতা কিংবা এজেন্ট যদি নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশী দামে ঔষধ বিক্রি করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ২ লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

**Breast-Milk Substitute (regulation of marketing) Ordinance 1984 :** International Code of Marketing of Breast-Milk Substitute 1981 অনুযায়ী মাতৃদুগ্ধের বিকল্প খাদ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৮৪ সালে Breast-Milk Substitute (regulation of marketing) Ordinance জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি এমন কোনো বিজ্ঞাপন তৈরী, প্রদর্শন, অথবা বিপণন করতে পারবে না যা দেখে ক্রেতার এমন ধারণা হতে পারে যে, ঐ পণ্য মাতৃদুগ্ধের থেকেও বেশী পুষ্টিকর বা স্বাস্থ্যকর। এছাড়া মাতৃদুগ্ধের বিপণন অবশ্যই এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী হতে হবে এবং মাতৃদুগ্ধের বিকল্প পণ্য পরিবহণের সময় বহনকারী পণ্য বা প্যাকেটের গায়ে অবশ্যই শিশুর ছবি থাকতে হবে। এই অধ্যাদেশের ৭ ধারা অনুযায়ী এই অধ্যাদেশের অধীনে জারিকৃত ধারা ৩, ৪, ৫ অমান্য বা ভঙ্গ করলে ভঙ্গকারীর সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।

**ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ :** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) নামীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ ২০০৩ সালের ১৬ জুন তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে ২০০৪ তারিখে অনুস্বাক্ষর করার পর ২০০৫ সালে এই আইনটি প্রণয়ন করে।

এই আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তি পাবলিক প্লেসে এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করিতে পারিবেন না এবং কোন ব্যক্তি এই বিধান ভঙ্গ করলে তার ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হবেন[৩৪]। ধূমপান এলাকা হিসেবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে

---

[৩৩]. Section 14 of *Drugs (Control) Ordinance*, 1982

[৩৪]. ধারা ৪- *ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫*

প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।[৩৫] তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে বড় স্পষ্টত দৃশ্যমান ভাবে ও বড়মাপে (মোট জায়গার অন্যূন ৩০% শতাংশ পরিমাণ) নিম্নবর্ণিত বিষয় মুদ্রণ করতে হবে-

১. ধূমপান মৃত্যু ঘটায়
২. ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়
৩. ধূমপান হৃদরোগের কারণ
৪. ধূমপান ফুসফুস ক্যান্সারের কারণ
৫. ধূমপানের কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা হয়
৬. ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
৭. এই বিধান লঙ্ঘনের জন্য তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১,০০০ (এক হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[৩৬]

The Animal Slaughter (Restriction) and Meat Control Act 1957 : এই আইনের অধীনে নির্দিষ্ট দিন ব্যতীত (নিষিদ্ধ দিনে) পশু জবাই করার জন্য এবং ধারা ৩,ও ৪ ভঙ্গ এ উল্লেখিত বয়স সীমা ভঙ্গ করে পশু জবাই করার জন্য ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)[৩৭]: বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, মান নিয়ন্ত্রণ এবং ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে শিল্প, খাদ্য ও রাসায়নিক পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ বিএসটিআই এর প্রধান কাজ। তাছাড়া দেশব্যাপী সরকার নির্ধারিত ওজন পরিমাপের বিষয়টিও তারা প্রয়োগ করে। Bangladesh Standrad Institution (BSTI) and The Central Testing Laboratories (CTL) একত্র হয়ে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদন এবং ভেজালরোধে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৪ সালে International Organisation for standardization (ISO) এর সদস্য হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সদস্য। এগুলো হচ্ছে-

---

[৩৫]. ধারা ৮- *ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন*, ২০০৫
[৩৬]. ধারা ১০, প্রাগুক্ত
[৩৭]. http://www.bsti.gov.bd/about.html, visited on 28-11-11

- International Organization for Legal Metrology (OIML)
- Codex Alimentarius Commission (CAC) of FAO/WHO
- International Electrotechnical Commission (IEC)
- Asia Pacific Metrology Programme (APMP)
- Asian Forum for Information Technology (AFIT)
- ISO Information Network (ISO NET)
- Standing Group for Standardization, Metrology, Testing and Quality

**ভেজাল বিরোধী বর্তমান অভিযান ঃ** সরকার ভেজাল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত (Mobile court), বিশেষ আদালত (Special Tribunal), ড্রাগ আদালত (Drug Court) এবং ফুড কোর্ট (বিশেষ কোর্ট) The Food (Speicial Court) অন্যতম।

**ভ্রাম্যমাণ আদালত (Mobile Court) ঃ** ভ্রাম্যমাণ আদালত The Mobile Court Ordiance 2007 এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আদালত শুধু আর্থিক জরিমানা করতে পারে। এ আইনের তফসিলে উল্লেখিত সীমা পর্যন্ত আদালত জরিমানা আদায় করতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি তার উপর আরোপিত জরিমানা দিতে ব্যর্থ হয় তবে এই আদালত তাকে সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড দিতে পারে।

**বিশেষ আদালত (Special Tribunal) :** এই আদালত The Special Powers Act, 1974 Gi মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। GKRb Sessions Judge, Additional Sessions Judge Ges Assistant Sessions Judge তার এখতিয়ার অন্তর্ভুক্ত সীমানায় এই আদালত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সরকার ইচ্ছা করলে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এক বা একাধিক বিশেষ আদালত গঠন করতে পারে। এই আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে।

**ড্রাগ আদালত :** এই আদালত The Drugs (Control) Ordinance 1982 এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভেজাল ঔষধ কিংবা অনিবন্ধিত ঔষধ উৎপাদন, আমদানি, বিতরণ, মজুদকরণ অথবা বিক্রির জন্য এই আদালত সর্বোচ্চ ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা ২,০০,০০০ দুই লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডকিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে। অনুমতি ব্যতীত কোন ঔষধ এর কাঁচামাল আমাদানি করা হলে সর্বোচ্চ ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। রেজিস্ট্রার্ড

চিকিৎসক ব্যতীত ব্যবস্থাপত্র দেয়া হলে ঐ ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা দুই লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডাকিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে।

**ফুড কোর্ট (বিশেষ কোর্ট) :** এই আদালত The Food (Special Court) Act 1956 এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আদালত সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা সহ অপরাধ সংঘটনের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

**এই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ আইনের শাস্তি সংক্রান্ত বিধানগুলো নিম্নরূপ-**

১. সঠিকভাবে প্যাকেট না করার জন্য শাস্তি;
২. মূল্য তালিকা না দেখানোর জন্য শাস্তি;
৩. সেবার ক্ষেত্রে মূল্য তালিকা সংরক্ষণ এবং প্রর্দশন না করার শাস্তি;
৪. যে কোনো পণ্য, ঔষধ বা সেবা নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির শাস্তি;
৫. ভেজাল পণ্য বা ঔষধ বিক্রি করার শাস্তি;
৬. নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্যের সাথে ব্যবহার করার শাস্তি;
৭. পণ্য অবৈধ উপায়ে উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ এর জন্য শাস্তি;
৮. ভূয়া বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ক্ষতি সাধনের জন্য শাস্তি;
৯. ওজনে কম দেয়ার জন্য শাস্তি;
১০. ওজন মাপক বা অন্য কোনো ওজন মাপক যন্ত্রে প্রতারণার জন্য শাস্তি;
১১. নকল পণ্য বিক্রি করার ও ওজনে কম দেয়ার জন্য শাস্তি;
১২. Date expired কোনো পণ্য বা ঔষধ বিক্রি করার শাস্তি;
১৩. একই অপরাধ পুনরায় সংঘটনের শাস্তি এবং
১৪. চুক্তি ভুক্ত পণ্য বা সেবা চুক্তি অনুযায়ী না দেয়ার শাস্তি।

**ভোক্তা অধিকার রক্ষার্থে কতিপয় সুপারিশ**

১. আমরা সারাদিন পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করি কি ভেজাল খাদ্য কেনার জন্য? এই ভেজাল এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে জনসচেতনতা। এ ব্যাপারে আমাদের জনমত গড়ে তুলতে হবে যেন আমরা খাদ্যে ভেজাল না মিশাই এবং ভেজাল খাদ্য ক্রয় না করি।

২. আমরা সাধারণত বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হই। সুতরাং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মিডিয়া জনমত গঠনে কতটুকু সাহায্য করে তা আমরা মিনা কার্টুন থেকে দেখতে পেরেছি। যেমন আমরা ধূসর (ভিটামিন যুক্ত) চালের চেয়ে সাদা (কম ভিটামিন যুক্ত) চাল বেশি পছন্দ করি কিন্তু এব্যাপারে

সচেতন হতে হবে। সুতরাং মিডিয়া এমন বিজ্ঞাপন প্রচার করবে না যা বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

৩. ঢাকা সিটি করপোরেশনকে ১০ টি জোনে বিভক্ত করে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। কিন্তু আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রশিক্ষিত লোকবল নেই বা ম্যাজিস্ট্রেট নেই যা কিনা এই ১০ জোনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খাদ্য সামগ্রী ঢাকা এবং তার আশপাশের এলাকায় এসে পৌঁছায়। আর এই দীর্ঘ যাত্রা পথে পণ্য সামগ্রী যেন নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য তারা বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের দু'টি করণীয় আছে। প্রথমত : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে যেন পরিবহণ সময় কমে আসে এবং সেক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করার প্রবণতা কমে যাবে। দ্বিতীয়ত : আমাদের বিকল্প ও কম ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রবর্তন করতে হবে।

৫. দরিদ্র এবং অশিক্ষিত শ্রমিকদের খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৬. জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার খাদ্য দূষণের আরেকটি কারণ। এক্ষেত্রে কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং কীভাবে কম রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে কৃষি কাজ করা যায় সে মর্মে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে Bio-fertilizer ব্যবহার করতে হবে। এই ব্যাপারে আমরা চীন থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারি।

৭. আমরা জানি, খাদ্যে ভেজালের কাজে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় তা অধিকাংশ আসে বিদেশ থেকে। সুতরাং এ সব রাসায়নিক দ্রব্য আমদানির উপর কঠিন শর্ত আরোপ করলে এগুলোর আমদানি হয়তো একটু হলেও কমবে।

৮. অবৈধ ব্যবসায়ী এবং তাদের সহযোগীদের যারা পণ্যে ভেজালসহ নানাধরনের অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যেন অন্যরা দেখে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

৯. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্যে ভেজাল ও এর সম্ভাব্য প্রতিকার ও শাস্তি যুক্ত করে দিতে হবে। তাহলে ভবিষ্যতে ভেজাল এর পরিমাণ কমে আসতে পারে।

ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের অনেক আইন আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এ আইনগুলোর কিছু বিধান ও তাদের প্রয়োগ নিয়ে। যেমন- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এ ভেজালকারীর বিপক্ষে শুধু সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ মামলা দায়ের করতে পারবে না। একজন সাধারণ ভুক্তভোগী তার

ভোগান্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের নিকট অভিযোগ করা ব্যতীত অন্য কোনো আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না।

১০. বর্তমান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের আরেকটি বড় বাধা হল, এ আইনে অভিযোগ করার ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগপত্র জমা না দিলে সংশ্লিষ্ট আদালত সেটি আমলে নিবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে আদালত আপেক্ষিকভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে অক্ষম এবং এ ক্ষমতার ফলশ্রুতিতে দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের উপর বর্তায় আর তখনই দুর্নীতির জন্ম হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা তখন আদালতে না ছুটে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের লোকদের খুশি করে দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয় ফলে আমরা পাই ভেজালযুক্ত অনেক পণ্য। অতএব সংশ্লিষ্ট দুর্বল দিকগুলো দূর করে আইনটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা জরুরি।

**উপসংহার**

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা অনুযায়ী স্বাস্থ্য হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এটি হচ্ছে মৌলিক প্রয়োজন। সুতরাং স্বাস্থ্য বিষয়টিকে শুধু বাংলাদেশে নয় অন্তর্জাতিক অঙ্গনেও খুব গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অনিশ্চিয়তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে কিছু স্বার্থপর মহল খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের মাধ্যমে। বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই ভেজালের হাত থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আইন ছিল না। ২০০৮ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটি অধ্যাদেশ জারি করেন এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল এটি আইনে পরিণত হয়। এ ছাড়া বিএসটিআই এ মর্মে কাজ করে যাচেছ। কিন্তু এই সমস্ত আইন বাস্তবে ভোক্তা অধিকার কতটুকু সংরক্ষণ করতে পেরেছে তা বিবেচ্য বিষয়। আইন আইনের জায়গাতেই রয়ে গেছে, কাজ করে যাচ্ছে শুধু মোবাইল কোর্ট। যদিও Mobile Court Ordinance 2007 এখন পর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি। কিন্তু আরো বেশ কিছু আইন আছে যার মাধ্যমে সরকার এ সমস্ত ভ্রাম্যমাণ আদালতের জনবল ও ম্যাজিস্ট্রেট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের উদাসীনতার কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সুতরাং ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন নয় বরং পুরনো আইনগুলো আরো বাস্তবমুখী করা ও তৃণমূল পর্যায়ে এ ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই যথেষ্ট। সবশেষে এই কথা বলতে চাই যে, ভেজাল রোধ করার জন্য আমরা যদি আমাদের নৈতিকতাকে বা বিবেককে জাগ্রত কিংবা সচেতন না করতে পারি তাহলে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কখনই ভেজাল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয়।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩০
এপ্রিল-জুন : ২০১২

# ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক*

*[সারসংক্ষেপ : আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু মানুষ কখনো কখনো তার এ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ভুলে যায়। ফলে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর এ কলহ-বিবাদ নিরসনের লক্ষে প্রয়োজন ন্যায়বিচারের। এ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে মানবাধিকার নিশ্চিত করা ইসলামের দাবি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আদম আ. থেকে মুহাম্মদ স. এবং তৎপরবর্তী মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ যুগে যুগে যে অবদান রেখেছেন তা পৃথিবীর আর কোন ব্যক্তি, ধর্ম কিংবা মতবাদ রাখতে পারেনি। ন্যায়বিচারের চিত্রতুলে ধরার লক্ষে এ প্রবন্ধে ন্যায়বিচার, ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা, বিচারব্যবস্থার ইতিবৃত্ত, ইসলামী বিচারব্যবস্থার বিবর্তন, আল-কুরআন ও আল-হাদীসে ন্যায়বিচার, মহানবী স. প্রবর্তিত বিচারালয়, মহানবী স.-এর বিচার পদ্ধতি ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।]*

## ন্যায়বিচার

ন্যায়বিচার শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ 'আদল' (عدل) এবং এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Justice, Fairness, Impartiality, Proper conduct. যেমন বলা হয়- وزير العادل Minirter of Justice.। আর যিনি ন্যায়বিচার করেন তাকে বলা হয় আদিল (ন্যায়বিচারক)।[১]

আল-আদল (العدل) মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম। তিনি যেহেতু তাঁর সর্বশ্রেণীর সৃষ্টির প্রতি সর্বতোভাবে ন্যায়বিচার করেন এবং কখনো অবিচার করেন না কাজেই এ শব্দটি তাঁর ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রয়োগের দাবি রাখে। আদল অর্থ-ভারসাম্য ও সমন্বয়। আল্লাহ যে আদলের হুকুম দিয়েছেন তার অর্থ ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠার নাম। এ হুকুমের দাবি হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আদায় করতে হবে। আর তাহলেই ভারসাম্য রক্ষা পাবে, সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১. Hans Wehr, A Dictionary of *Modern Written Arabic*, London: Macdonald and Evans Ltd. 1974, PP. 596-597.

হবে।[২] আর আদালত বলা হয় এমন প্রতিষ্ঠানকে যেখানে প্রজ্ঞা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বীরত্ব ও ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পাদন করা হয়।[৩]

### প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব। আর মানব সমাজ সমস্যাসংকুল। অথচ মানব সমাজেই আমাদের বসবাস করতে হবে। এই সমাজকে মানুষের জন্য শান্তিময় ও বাস-উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষে যুগ যুগ ধরে মানুষ অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর সেই প্রয়াসের অংশ হিসেবে বিধিবদ্ধ হয়েছে আইন। মানুষের জীবনের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণকে সমাজের মানুষের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত করার জন্যই প্রয়োজন হয় আইনের। আর এই আইন সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন হয় বিচারব্যবস্থার। বিচারব্যবস্থা যদি না থাকে এবং বিচারের রায় কার্যকর করার কর্তৃপক্ষ যদি না থাকে তাহলে মহৎ ও কল্যাণকর আইন প্রণয়ন করেও কোন লাভ নেই।

বর্তমান মানব সভ্যতায় রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা। আর এ অধিকার ও কর্তব্য পালনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব অপরিহার্য। তাই আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষে বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।[৪]

### বিচারব্যবস্থার ইতিবৃত্ত

বিচারব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারার প্রতি তাকালে দেখা যাবে, অতীতে আধুনিক যুগের ন্যায় সুসংগঠিত সমাজ ও বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব পৃথিবীর কোথাও বিদ্যমান ছিল না। মানুষ আঘাত পেলে প্রত্যাঘাত করত-এটাই ছিল তদানীন্তন বিচারব্যবস্থার ভিত্তি। প্রাচীন সভ্য জাতিগুলোর বিচারব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোথাও আপস- রফার ভিত্তিতে, কোথাও রাজার ঘোষিত আইনে, কোথাও পুরোহিতদের রায়ের ভিত্তিতে আবার ধর্মীয় আইন ও রোমান আইনের ভিত্তিতে বিচার কার্য সম্পাদিত হতো।[৫]

### ইসলামী বিচারব্যবস্থার বিবর্তন

মানবেতিহাসের কোনো কোনো পর্যায়ে ইসলামী সভ্যতাকে উপেক্ষ করে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়েছে। ফলে বিচারব্যবস্থার লক্ষ ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। পক্ষান্তরে মানবতার পরম বন্ধু

---

২. সাইয়েদ আবুল আলা, *আসমাউল হুসনা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ১৩০।
৩. ড. মাদকুর, ইবরাহীম, *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, ইউপি : দেওবন্দ, যাকারিয়া বুক ডিপো, ২০০১, পৃ. ৫৮৮।
৪. গাজী শামছুর রহমান, *আইনবিদ্যা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৫৫৫-৫৫৬।
৫. Holmes Jr. oliver Wendell. *The common Law*. Boston : Little Brown, 1881, P. 2.

নবী-রাসূলগণ আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান দ্বারা মানব জাতিকে পরিচালনা করে তাদের ন্যায্য অধিকার বিশ্ব পরিক্রমায় নিশ্চিত করেছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট নবীর ন্যায়বিচার সম্পর্কে আলোকপাত করা হলে করা হলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

**আদম আ.**

মানব জাতির পিতা আদম আ. তাঁর দুই পুত্র যথাক্রমে হাবীল ও কাবীলের মধ্যকার কলহ-বিবাদ নিষ্পত্তিকল্পে ন্যায়বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর বিচারের নমুনা ছিল এরূপ-বিবাদমান দুই সন্তানকে তিনি কুরবানী করে পর্বত চূড়ায় রেখে আসার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে তাদের নির্দেশ দেন, যেন তারা তাই করে। তারা তাই করল। একজনের কুরবানী আকাশ থেকে আগুন এসে পুড়িয়ে জানিয়ে দিল, তার কুরবানী কবুল হয়েছে এবং অপরজনের কুরবানী পঁচে নষ্ট হয়ে যায় এবং জানান হয় যে, তার কুরবানী কবুল হয়নি। এভাবে আসমানী ব্যবস্থাপনায় সর্বপ্রথম ন্যায়বিচারের শুভ সূচনা হয়।[৬]

**ইউসুফ আ.**

ইউসুফ আ. মিসরের খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে মিসরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাঁর ভাইয়েরা তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থী হলে তিনি তাদের প্রচুর খাদ্য সামগ্রী দান করেন। তারা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে কিছু দূর চলে যায়। ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে, সরকারের খাদ্য পরিমাপের পাত্রটি হারিয়ে গেছে। কাজেই আগন্তুক দলকে ডেকে এনে তদন্ত করতে হবে। কার্যত তাই করা হলো। পাত্রটি ইউসুফ আ.-এর সহোদরের বস্তার ভেতরে পাওয়া যায় এবং তাকে আটক করা হয়। বৈপিত্রেয় ভাইদের অনুরোধ ছিল যেন, ইউসুফের সহোদরকে ছেড়ে দিয়ে তাদের অপর কোন ভাইকে আটক করা হয়। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তিনি আইনের দৃষ্টিতে যে দোষী তাকে আটক করার পক্ষে ফয়সালা দেন। এভাবে তিনি ভাইদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।[৭]

**মূসা আ.**

একবার মূসা আ. মানাফ নামক স্থানে পৌছে বিবাদের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পেলেন, দুই ব্যক্তি মারামারি করছে। তাদের একজন ছিল বনী ইসরাঈলের এবং অপরজন ছিল কিবতী। কিবতী লোকটি বনী ইসরাঈলের লোকটিকে বিনা পারিশ্রমিকে কাজে খাটাবার জন্য বল প্রয়োগ করছিল। এ সময়

---

৬. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ১, পৃ. ৮২।

৭. ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ* (অপ্রকাশিত পি এইচ. ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭), পৃ. ৬৪।

কিবতীর বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের লোকটি মূসা আ.-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করলো। মূসা আ. তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিলেন কিন্তু সে তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাকে ঘুষি মারলেন। ফলে সে নিহত হয়। বিষয়টি কুর'আনেও বিধৃত হয়েছে : "তিনি নগরীতে প্রবেশ করলেন, আর তখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন, একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রু দলের। মূসা আ.-এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা আ. তাকে সজোরে ঘুষি মারলেন। এভাবে তিনি তাকে হত্যা করলেন।"এভাবে মূসা আ. ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন।[৮]

**দাউদ ও সুলায়মান আ.**

দাউদ ও সুলাইমান আ.-এর মাঝে ছিল পিতা-পুত্র সম্পর্ক। তাঁদের সময় এক ব্যক্তির ক্ষেতে রাতের বেলা অপর এক ব্যক্তির মেষপাল প্রবেশ করে ফসল বিনষ্ট করে দেয়। অতঃপর উভয় পক্ষ দাউদ আ.-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করে। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে ক্ষেতের মালিককে মেষপাল দান করার পক্ষে রায় দিলেন।

পক্ষদ্বয় সুলায়মান আ.-এর নিকট দিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি তাদেরকে বিচারের রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি পক্ষদ্বয়ের নিকট রায়ের কথা শুনে বললেন, মীমাংসা এভাবেও হতে পারে যে, মেষপাল ক্ষেতের মালিককে দেয়া হবে এবং সে এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করবে। আর ক্ষেত পূর্বাবস্থায় ফিরে এলে সে তা মালিককে বুঝিয়ে দিবে এবং নিজের মেষপাল ফেরত নিবে।

হাদীসে পিতা-পুত্রের রায়ের পার্থক্য সংক্রান্ত আরো একটি ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "দুই মহিলার দু'টি দুগ্ধপোষ্য পুত্র সন্তান ছিল। একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তখন অপর মহিলা বললো, তোমার পুত্রকেই নেকড়ে বাঘ নিয়ে গেছে। অন্য মহিলা বললো, নেকড়ে বাঘ তোমার পুত্রকে নিয়ে গেছে। অতঃপর তারা উভয়ে দাউদ আ.-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করলে তিনি অধিক বয়স্কা মহিলার পক্ষে রায় দেন। তারা সুলায়মান আ.-কে মোকদ্দমার বিষয় অবহিত করলে তিনি বললেন, 'একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি সন্তনটিকে দু'ভাগ করে তাদের দু'জনের মাঝে ভাগ করে দিবো। অল্প বয়স্ক মহিলা বললো, আপনি এরূপ করবেন না, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। তিনি বললেন, শিশুটি তারই হবে। একথা শোনার পর তিনি অল্প বয়স্কা মহিলার পক্ষে রায় দেন"। কুর'আনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে দাউদ আ. ও সুলায়মান আ.-এর ন্যায়বিচারের বিষয় অবগত হওয়া যায়।[৯]

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।

**আল-কুরআনে ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ**

কুরআন মাজীদ কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ নির্ভুল আসমানী গ্রন্থ। এতে মানব জাতির ইহ-পারলৌকিক উভয় জগতের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত ইসলামী আইন ও ন্যায়বিচার সম্পর্কীয় বিষয়ে প্রচুর সংখ্যক আয়াত বিবৃত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কীয় কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো-

"তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন"।[১০]

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর"।[১১]

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা"।[১২]

"আর আপনি যদি বিচার–নিষ্পত্তি করেন, তবে তাদের মধ্যে সুবিচার করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন"।[১৩]

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ। যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। তোমরা যদি পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন"।[১৪]

---

১০. আল-কুরআন, ৫:৮ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

১১. আল-কুরআন, ১৬:৯০।

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

১২. আল-কুরআন, ৪:৫৮।

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

১৩. আল-কুরআন, ৫:৪২ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

১৪. আল-কুরআন, ৪:১৩৫।

"বলুন, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের"।[১৫]

"আমি তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন তদনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করেন এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না"।[১৬]

"বলুন, হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, আপনি তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দিন"।[১৭]

"কর্তৃত্ব আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ"।[১৮]

"আমি তাদের জন্য বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতর বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা রক্ষা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই জালিম।"[১৯]

"বলুন, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে"।[২০]

---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

১৫. আল-কুরআন, ৭ : ২৯ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

১৬. আল-কুরআন, ৪:১০৫।

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

১৭. আল-কুরআন, ৩৯:৪৬।

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

১৮. আল-কুরআন, ৬:৫৭ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

১৯. আল-কুরআন, ৫:৪৫।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

২০. আল-কুরআর, ৪২:১৫ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

"সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না"।[২১]
"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে"।[২২]

**আল-হাদীসে বিচারব্যবস্থা প্রসঙ্গ**

মহানবী স. মানব সমাজে সর্বাত্মকভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে তিনি যেসব নির্দেশনা প্রদান করেন তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ-

**১. বিচারকের মর্যাদা**

বুরায়দা রা. বলেন, নবী স. বলেছেন : "বিচারক তিন শ্রেণীভুক্ত। দুই শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামী এবং এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতী। যে বিচারক জ্ঞাতসারে অন্যায় রায় প্রদান করে সে জাহান্নামী। আর যে বিচারক সত্য উপলব্ধি না করে মানুষের অধিকারসমূহ নস্যাৎ করে সেও জাহান্নামী। আর যে বিচারক ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা দান করে সে জান্নাতী"।[২৩]

ইবনে আবূ আওফা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত যুলুম না করে ততক্ষণ আল্লাহ তার সাথে থাকেন। যখন সে যুলুম করে তখন তিনি তাকে ত্যাগ করেন এবং শয়তান তাকে আকড়ে ধরে"।[২৪]

আবু সাঈদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটে উপবেশনকারী হবে। তাদের মধ্যে যালিম শাসকই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত এবং তাঁর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী হবে"।[২৫]

**২. বিচারকের পদ ঝুঁকিপূর্ণ**

আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: "যাকে জনগণের বিচারক নিযুক্ত করা হল তাকে বিনা ছুরিতে যবেহ করা হলো"।[২৬]

---

২১. আল-কুরআন, ৪:১৩৫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا

২২. আল-কুরআন, ৫:৮ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا

২৩. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ আন রসূলিল্লাহ স. ফিল কাযী, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৭৮৪।

২৪. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ ফিল ইমামিল আদিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮৫।

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, অনুচ্ছেদঃ মা জাআ আন রসূলিল্লাহ স. ফিল কাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮৪।

আবদুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: "যে কোন বিচারক মানুষের মাঝে বিচার করে তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, ফিরিশতা তার ঘাড় ধরে রাখবে। অত:পর সেই বিচারক আকাশের দিকে মাথা উঠাবে। আর আল্লাহ যদি বলেন, ওকে নিক্ষেপ কর, অমনি একজন ফিরিশতা একটি গর্তে তাকে নিক্ষেপ করবেন, যার গভীরতা হবে চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব"।[২৭]

### ৩. বিচারকের দোষ-ত্রুটি

আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন: "যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারকের পদ প্রার্থনা করে বিচারক নিযুক্ত হয় এবং যুলুমের উপর তার ন্যায়পরায়ণতা প্রাধান্য পায়, সে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে যার যুলুম তার ইনসাফের উপর প্রাধান্য লাভ করবে, সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে"।[২৮]

### ৪. ক্ষুব্ধ অবস্থায় বিচার-ফয়সালা করা

আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা রা. বলেন, "আবু বাকরা রা. সিজিস্তানে অবস্থানকালে তার পুত্র (আবদুর রহমান)-কে লিখে পাঠালেন : তুমি ক্ষুব্ধ অবস্থায় দুই ব্যক্তির মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে না। কেননা আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি : কোন বিচারক যেন ক্ষুব্ধ অবস্থায় দুই ব্যক্তির মাঝে বিচার-ফয়সালা না করে"।[২৯]

### ৫. বিচারকের সামনে বাদী ও বিবাদীর বসার নিয়ম

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স. এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন যে, বিচারের সময় বাদী ও বিবাদী উভয়েই বিচারকের সামনে বসবে"।[৩০]

### ৬. উৎকোচ গ্রহণ

আবূ হুমাইদ আস-সাঈদী রা. বলেন, "বনু আসাদ গোত্রের ইবনুল লুতবিয়াকে নবী স. যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। অতঃপর সে মদীনায় উপস্থিত হয়ে বলল: এটা আপনাদের জন্য আর এটা আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে। একথা শুনে নবী স. মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন তারপর বললেন : কী হল সেই কর্মচারীর, যাকে আমরা যাকাত উসূল করার জন্য প্রেরণ করি। অতঃপর সে এসে বলে: এটা তোমাদের জন্য আর এটা আমার জন্য। তবে কেন সে তার পিতা অথবা মাতার ঘরে বসে থাকছে না? তারপর সে দেখুক

---

[২৭]. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : আত-তাগলীযু ফিল হাইফি ওয়ার রিশওয়াতি, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২৬১৫।

[২৮]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : ফিল কাযী ইউখতী, পৃ. ১৪৮৮।

[২৯]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : হাল ইয়াকযিল কাযী আও ইউফতি ওয়া হুয়া গাদবানু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬

[৩০]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : আল-হাকামু বাইনা আহলিয-যিম্মাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮৯।

তাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা? সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, যে কোনব্যক্তি অবৈধভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা তার ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে। যদি তা উট হয় তবে তা ঘোঁত ঘোঁত করবে অথবা যদি তা গাভী হয় তবে সে হাম্বা হাম্বা করবে অথবা যদি তা ছাগল হয় তবে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে"।[৩১]

**৭. মিথ্যা শপথ করে অন্যের হক আত্মসাৎ করা**

আবূ উমামা আল-হারিসী রা. রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন: "কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের হক মিথ্যা শপথ করে আত্মসাৎ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! তা যদি সামান্য জিনিস হয়? তিনি বললেন: তা পিলু গাছের একটি মিসওয়াকের সমান হলেও"।[৩২]

## মহানবী স. প্রবর্তিত বিচারালয়

মহানবী স. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠকল্পে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে বিচারালয় স্থাপন করেন। তাঁর প্রবর্তিত বিচারালয়ের কাঠামো নিম্নরূপ :

বিচারালয় প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন-

(১) কেন্দ্রীয় বিচারালয়

(২) আঞ্চলিক বিচারালয়

কেন্দ্রীয় বিচারালয়কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় -

- প্রধান বিচারালয়
- ভ্রাম্যমাণ আদালত ও
- বিশেষ আদালত (স্পেশাল ট্রাইবুনাল)

## প্রধান বিচারালয়

এই আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্বয়ং মহানবী মুহাম্মাদ স.। তাঁর আদালতকে "আল-আদালাতুল উযমা' বা সুপ্রিম কোর্ট (সর্বোচ্চ বিচারালয়) বলা হতো। বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তিনি কোন পৃথক ভবন তৈরি করেননি। তিনি মসজিদে নববীকেই আদালত হিসেবে ব্যবহার করতেন। ইমাম বুখারী র. তাঁর সহীহ গ্রন্থে সালাত অধ্যায়ে একটি অনুচ্ছেদের নামকরণ করেন : "আল-কাযা ওয়াল-লি'আন ফিল-মাসজিদ" (মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং নারী-পুরুষের মধ্যে লি'আন করানো)। অতঃপর তিনি এতদসম্পর্কিত হাদীস সংকলন করেন।[৩৩]

---

[৩১]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : হাদায়াল উম্মাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮।

[৩২]. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মান হালাফা আলা ইয়ামিনীন ফাজিরাতিন লি-ইয়াক তাতিয়া বিহা মালান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১৬।

[৩৩]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আল-কাযা ওয়াল লি'আন ফিল মাসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

আবূ হুরায়রা রা. বলেন, "নবী স. কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারা বনু হানাফী গোত্রের সুমামা ইবনে উসালকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে এসে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। নবী স. তার কাছে গেলেন এবং লোকদের বললেন : সুমামাকে ছেড়ে দাও। মুক্তি পেয়ে সে মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করলো এবং মসজিদে প্রবেশ করে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ স. আল্লাহর রসূল"।[৩৪]

**ভ্রাম্যমাণ আদালত**

মহানবী স. কেবল মসজিদে নববীতেই বিচারকার্য সম্পাদন করতেন না, সফর অবস্থায়ও তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কোন অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই ব্যাপারে নির্দেশ জারী করতেন। আবূ মাসউদ রা. বলেন, "আমি আমার দাসকে বেত্রাঘাত করছিলাম। এমন সময় পেছন দিক থেকে একটি শব্দ শোনলাম। আমাকে বলা হচ্ছে, হে আবূ মাসউদ! তুমি জেনে রেখ। দেখতে পেলাম, আল্লাহর রসূল আমার কাছে উপস্থিত এবং তিনি আমাকে বলছেন : হে আবূ মাসউদ! তুমি জেনে রেখ। হে আবূ মাসউদ! তুমি জেনে রেখ। অকস্মাৎ শব্দটি আমার কানে বেজে উঠলো। বর্ণনাকারী বলেন, এ শব্দটি শোনামাত্র আমি চাবুকটি ফেলে দিলাম। অতঃপর নবী স. বললেন : তুমি এ দাসের উপর যতটা কর্তৃত্বসম্পন্ন, তোমার উপর আল্লাহ্ তার চেয়েও অধিক শক্তিমান। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি বললাম : এরপর থেকে আমি আর কোন দাসকে প্রহার করবো না। অন্য বর্ণনায় আছে, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে দাসটি মুক্ত করে দিলাম। নবী স. বললেনঃ তুমি তা না করলে অবশ্যই জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করতো"।[৩৫]

মহানবী স. কখনো কখনো বাজারে গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির ও ভেজালের বিচার করতেন। একদা রসূলুল্লাহ স. খাদ্যশস্যের একটি স্তূপের নিকট দিয়ে যাবার সময় তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর আংগুলগুলো ভিজে গেলো। তিনি বিক্রেতাকে বললেন, এ কি? লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তিনি বললেন, তবে ওগুলো স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারতো? জেনে রেখ, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।[৩৬]

---

[৩৪]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আল-ইগতিসালু ইযা আসলামা ওয়া রাবতিল আসীর আইযান ফিল মাসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[৩৫]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-আয়মান, অনুচ্ছেদ : সুহবাতুল মামালীক, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ :দারুসসালাম, ২০০০, পৃ. ৯৬৯।

[৩৬]. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী কারাহিয়াতিল-গাশশি ফিল-বুয়ূ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮৪।

## বিশেষ আদালত (স্পেশাল ট্রাইবুনাল)

মহানবী মুহাম্মাদ স. তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে বিভিন্ন লোকের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। তিনি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো কোন কোন প্রবীণ সাহাবীকে মুকদ্দমা ফয়সালা করার নির্দেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে :

উকবা ইবনে আমির রা. বলেন, "একদা দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে মহানবী স.-এর কাছে এলো। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে উকবা! যাও, তুমি উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। এ ব্যাপারে আপনিই আমার চেয়ে অধিক উত্তম। তিনি বললেন, যা হোক, তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আমি বললাম: আমি যদি তাদের মধ্যে মীমাংসা করি, তাতে আমার লাভ কী? অপর বর্ণনায় আছে, কিসের জন্য আমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করবো? নবী স. বললেন : ইজতিহাদ করো, যদি তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারো, তবে তোমার জন্য দশটি প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তুমি ইজতিহাদে ভুল কর, তবে একটি প্রতিদান রয়েছে"।[৩৭]

## আঞ্চলিক বিচারালয়

মহানবী স. ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে আঞ্চলিক প্রশাসন ও বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন গোত্রের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তিনি তাদের প্রধানকেই প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন। আঞ্চলিকভাবে যেসব অঞ্চলে প্রশাসক বা বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তন্মধ্যে ইয়ামান, বাহরাইন ও মক্কা অন্যতম।

## ইয়ামানে বিচারক নিয়োগ

বিভিন্ন সীরাত ও হাদীস গ্রন্থের বরাতে জানা যায়, ইয়ামানে মহানবী স. তাঁর কয়েকজন খ্যাতিমান সাহাবীকে প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরা একই সাথে প্রশাসক ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। বর্ণিত আছে, মহানবী স. বিদায় হজ্জের পূর্বে আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা.-কে, অতঃপর মু'আয ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামানের প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। তৎকালে ইয়ামানে দু'টি প্রদেশ ছিল। তিনি তাদেরকে ভিন্ন প্রদেশে প্রেরণকালে বললেন : "তোমরা লোকদের সাথে কোমল ব্যবহার করবে, কঠোর ব্যবহার করবে না, লোকদের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ যোগাবে, অনীহা ভাব সৃষ্টি করবে না"। এরপর তাঁরা দু'জন নিজ নিজ শাসনাধীন এলাকায় চলে যান। তাঁরা যখন নিজ নিজ এলাকা সফর করতেন

---

৩৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতে খায়রিল ইবাদ*, বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩, খ. ১১, পৃ. ৩২৫

এবং অন্যজনের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছতেন তখন সাক্ষাৎ হলে তাঁরা পরস্পর সালাম বিনিময় করতেন।[৩৮]

ইমাম ওয়াকী র. তার আখবারুল কুযাত গ্রন্থে লিখেছেন, নবী স. আবূ মূসা রা.-কে ওমানে প্রশাসক হিসাবে এবং অন্যান্যদেরকে বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।[৩৯]

আলী রা. বলেন, "নবী স. আমাকে যখন বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেন তখন আমি ছিলাম নবীন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করছেন যাদের মধ্যে অনেক ঘটনা বিরাজমান, অথচ বিচারের ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞান নেই। নবী স. বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে পথ দেখাবেন এবং তোমার অন্তর মযবুত করে দিবেন। আলী রা. বলেন, এরপর আমি বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে কখনো ইতস্ততবোধ করিনি"।[৪০]

ইয়ামানে প্রেরিত বিচারকদের মাঝে দিহ্‌য়া আল-কালবী রা.-এর নামও পাওয়া যায়। ইমাম আল-মাওয়ারদী র. উল্লেখ করেছেন, নবী স. ইয়ামানের কোন এক অঞ্চলে দিহ্‌য়া আল-কালবীকে বিচারক নিয়োগ করেছিলেন। দিহ্‌য়া আল-কালবী রা. দেখতে জিবরাঈল আ. -এর ন্যায় ছিলেন।[৪১]

### বাহরায়নে বিচারক নিয়োগ

পঞ্চম হিজরী কিংবা তৎপূর্বে বাহরায়নের আবদুল কায়েস গোত্রের প্রথম প্রতিনিধি দল মদীনায় নবী স. -এর দরবারে এসেছিল বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। তাদের দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল আসে নবম হিজরীতে। এদের সংখ্যা ছিল চল্লিশজন।[৪২]

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী স. বাহরায়নের প্রশাসক মুনযির ইবনে সাওয়া আল-আবদীর নিকট একটি পত্র লিখেন। আল-আলা আল-হাদরামী রা. ঐ চিঠি বহন করেছিলেন। মুনযির নবী স. -এর পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৪৩]

### মক্কায় বিচারক নিয়োগ

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী স. হুনায়ন অভিযানে যাওয়ার পূর্বে আত্তাব ইবনে উসাইদ রা.-কে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন। তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর। আল্লামা

---

৩৮. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায়: আল-মাগাযী, অনুচ্ছেদ : বা'ছু আবী মূসা ওয়া মু'আয ইলাল ইয়ামান কবলাল-হাজ্জ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৩৯. ড. যিয়াউর রহমান আযমী, *আকযিয়াতুর রসূল,* আল-কাহেরা : দারুল বুখারী, তা. বি. পৃ. ৪৬১।

৪০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : কাইফাল কাযা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮৮।

৪১. আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী, *আদাবুল কাযী,* বাগদাদ : মাতবাআতুল আনী, ১৯৭২, খ. ১, পৃ. ১৩২।

৪২. ড. আহমাদ মাহদী রিযকুল্লাহ, *আস-সীরাতুন্নাবাবিয়্যা ফী দাওইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ,* রিয়াদ : মারকাযুল মালিক ফায়সাল, ১৯৯২, পৃ. ৬৪২।

৪৩. অধ্যাপক এটি এম মুছলেহ উদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, ২০০৩, খ. ৫, পৃ. ৫৭৩।

মাওয়ারদী উল্লেখ করেন, নবী স. আত্তাব ইবনে উসাইদকে বিচারক নিয়োগ করে প্রেরণকালে বলেছিলেন : "হে আত্তাব! লোকজনকে এমন সম্পদ বিক্রয় করতে নিষেধ করবে যা তাদের হস্তগত হয়নি এবং এমন জিনিসের লভ্যাংশ নিতে বারণ করবে যার যিম্মাদারী তারা গ্রহণ করেনি"।[৪৪]

আনাস রা. বলেন, "মহানবী স. আত্তাব ইবনে উসাইদকে মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন মুনাফিকদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আত্তাব রা. বলেন, আমার কাছে যদি সংবাদ আসে যে, কোন ব্যক্তি জামা'আতে নামায পড়ে না, আমি তাকে হত্যা করবো। কেননা নামাযের জামা'আতে অনুপস্থিত ব্যক্তি মুনাফিক। একবার মক্কাবাসী নবী স.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি একজন কঠোর প্রকৃতির লোককে মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত করেছেন। জবাবে তিনি বললেন: আমি স্বপ্নে দেখেছি, সে জান্নাতের দরজায় এসে দরজার কড়া নাড়ছে। দরজা খুলে গেলে সে ভিতরে প্রবেশ করেছে"।[৪৫]

### ইয়ামামায় বিচারক নিয়োগ

মহানবী স. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.-কে ইয়ামামায় বিচারক নিযুক্ত করেন। বর্ণিত আছে যে, ইয়ামামা থেকে দুই ব্যক্তি একটি বাগানের মালিকানার ব্যাপারে ঝগড়া করে তার মীমাংসার জন্য নবী স.-এর দরবারে এসেছিল। নবী স. উক্ত বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য হুযায়ফা রা.-কে ইয়ামামায় প্রেরণ করেছিলেন।[৪৬]

### মহানবী স. কর্তৃক নিয়োগকৃত বিচারকবৃন্দ

মাসরূক র. বলেন, নবী স.-এর যুগে ছয় ব্যক্তি বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁরা হলেন ঃ উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবিত ও আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা.। আল্লামা শামী র. এ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। তবে তিনি স্বয়ং আরো কয়েকজন বিচারকের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা নবী স.-এর সময় বিচারকার্য সম্পাদন করেছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ উকবা ইবনে আমের, মু'আয ইবনে জাবাল, আল-আ'লা ইবনে হাযরামী রা., মা'কিল ইবনে ইয়াসার, আমর ইবনুল আ'স আল-কুরায়শী, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, আত্তাব ইবনে উসাইদ ও দিহইয়া আল-কালবী রা.।[৪৭]

---

[৪৪]. আল-মাওয়ারদী, *আদাবুল কাযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩১।

[৪৫]. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা*, আল-কাহেরা : মাতবাআতুস সাআদাহ, ১৯১০, খ. ২, পৃ. ৪৫১।

[৪৬]. ড. যিয়াউর রহমান আযমী, *আকযিয়াতুর রসূল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১-৪৬২।

[৪৭]. ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *ইসলামী বিচারব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৭।

**মহানবী স.-এর বিচার পদ্ধতি**

মহানবী স. বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করতেন এবং অন্যদেরকেও তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিতেন। এ সবের আলোকে তাঁর বিচারকার্যক্রমের একটি পদ্ধতি আমাদের সামনে ভেসে উঠে। নিম্নে তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হলো-

**(ক) অভিযোগ পেশ**

বেশির ভাগ বিচার কার্যক্রমে দেখা যায়, মহানবী স.-এর দরবারে লোকেরা আরযি পেশ করতো। তবে তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে পেশ করা হয়েছে। যেমন-

১. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি তার ভাই বা গোত্রীয় কোন ব্যক্তির হত্যার অভিযোগ করেছে কিংবা জমিজমা ইত্যাদির ঝগড়া মীমাংসা করার জন্য আরযি পেশ করেছে।

২. অপরাধী ব্যক্তি নিজেই ঈমানের তাকীদে নিজের উপর শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছে। যেমন, আসলাম গোত্রের মাইয আল-আসলামী নিজের কৃত অপরাধের বিষয় মহানবী স.-কে অবহিত করেছিলেন।[৪৮]

৩. তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ উত্থাপন। যেমন, মহানবী স. মাইযের ব্যভিচারের ঘটনাটি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন। তারপর মাইয আসলে মহানবী স. তাকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হন।[৪৯]

৪. আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত এক হাদীসে আছে, "এক ব্যক্তি নবী স. -এর দরবারে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নবী স. বললেন, কী ব্যাপার, তোমার কী হয়েছে? সে বললো, আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি ক্রীতদাস আছে যাকে তুমি মুক্ত করতে পার? সে বললো, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ষাটজন দুঃস্থকে আহার করাতে পারবে কি? সে এবারও বললো, না"।[৫০]

**(খ) সমন জারি**

কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করত, মহানবী স. বিচারক হিসেবে তাকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করতেন, এমনকি তিনি পত্র প্রেরণ করেও বিবাদীকে উপস্থিত

---

[৪৮]. ইমাম মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফির-রাজম, আল-কাহেরা : দারু ইবনিল হায়সাম, ২০০৫, পৃ. ৩৭।

[৪৯]. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিত তালকীনে ফিল-হাদ্দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯৬।

[৫০]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আস-সাওম, অনুচ্ছেদ : আল-মুজামে ফী রামাদানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

করতেন বলে কোন কোন ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায়। বর্ণিত আছে যে, "খায়বার যুদ্ধে ইয়াহূদীরা আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইলকে হত্যা করে। অতঃপর মুহায়্যাসা ও আবদুর ইবনে সুহাইল রা. মহানবী স.-এর কাছে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা দায়ের করেন। মহানবী স. ইয়াহূদীদেরকে তাদের মতামত জানাবার জন্য লিখিত সমন জারি করেন"।[৫১]

**(গ) আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ**

কোন ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগনামা দায়ের করার পর মহানবী স. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতেন। বর্ণিত আছে, "একবার দু'ব্যক্তি মহানবী স.-এর দরবারে এসে মামলা দায়ের করে। তাদের একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন। অপরজন বললো, হাঁ, আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন এবং তার পূর্বে আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। মহানবী স. বললেন : হাঁ, বলো। সে বললো, আমার ছেলে তার চাকুরী করতো এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে। লোকেরা বললো, তোমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। অতঃপর আমি একশ বকরী ও একটি দাসীর বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসি। .... নবী স. বললেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবো। তা হচ্ছে, তোমার বকরী ও দাসী ফেরত দেয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশো বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দেয়া হবে। অতঃপর তিনি উনাইস রা.-কে বললেন : সে যেন ঐ মহিলার কাছে যায় এবং যদি সে তার অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার করবে। মহিলাটি স্বীকারোক্তি করলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়"।[৫২]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। কারণ বিবাদীর পিতা তার বক্তব্য পেশ করতে চাইলে মহানবী স. তাকে বক্তব্যদানের অনুমতি দেন। মোটকথা মহানবী স. বিচার কার্যক্রমে বাদী-বিবাদী উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করতেন।

বর্ণিত আছে যে, একবার নবী স. আলী রা.-কে বিচারক নিয়োগ করার পর বললেন : "তোমার কাছে যখন দুই ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করে তখন উভয়ের বক্তব্য না শুনে বিচার-ফয়সালা করবে না"।[৫৩]

---

[৫১]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : কিতাবুল হাকিম ইলা উম্মালিহি ওয়াল কাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০।

[৫২]. ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদাবুল কুযাত, অনুচ্ছেদ : সাওনুন-নিসায়ী আন মাজলিসিল হাকাম, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ২৪৩৩।

[৫৩]. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিল-কাযী লা-ইয়াকযি বাইনাল খাসমাইনি হাত্তা ইয়াসমাআ কালামাহুমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮৫।

### (ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন

মহানবী স. বিচারকার্য সম্পাদনকালে বাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করার নির্দেশ দিতেন। মহানবী স. বলেন, "বাদীর দায়িত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা"।[৫৪]

অপর এক হাদীসে আছে, "মানুষের দাবির ভিত্তিতেই যদি সব কিছু দিয়ে দেয়া হয় তবে তারা কোন কওমের রক্ত কিংবা সম্পদও দাবি করে বসবে। কাজেই বাদী সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করবে এবং যে তা অস্বীকার করে (বিবাদী) তাকে শপথ করতে হবে"।[৫৫] আরো উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে যারা ইনসাফের প্রমাণ দিবে মহানবী স. তাদের প্রাধান্য দিতেন।

এ পর্যায়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছেঃ "এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে"।[৫৬]

মহানবী স. বলেছেন, "খিয়ানতকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, যেনার অপবাদ আরোপের কারণে শাস্তি ভোগকারী পুরুষ ও নারীর সাক্ষ্য, বিপক্ষের প্রতি বৈরিতা পোষণকারীর সাক্ষ্য, মিথ্যাবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্য, কোন পরিবারের পক্ষে তাদের অধীনস্থ লোকদের সাক্ষ্য এবং ওয়ালাআ (মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের মুক্তিদাতার পক্ষে) ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়"।[৫৭]

অপর এক বর্ণনায় আছে, "মহানবী স. জনৈক ব্যক্তির সফর অবস্থায় মৃত্যুকালীন ওসিয়াত অনুসারে তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের নিকট ফেরতদানের ব্যাপারে অমুসলিমদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন"।[৫৮] অমুসলিমদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা।

### (ঙ) শপথ

মহানবী স. আল্লাহর নামে শপথ করানোর মাধ্যমে লোকদের মাঝে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ আছে, "রসূলুল্লাহ স. ফয়সালা দিয়েছেন যে, বিবাদীকে শপথ করতে হবে"।[৫৯]

---

৫৪. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী,* অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী আন্নাল বায়্যিনাতা আলাল মুদ্দায়ী ওয়াল ইয়ামীনু আলাল মুদ্দা আলাইহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮৬।

৫৫. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান,* তা. বি. খ. ১০, পৃ. ২৫২।

৫৬. আল-কুরআন, ৬৫ : ২।

৫৭. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী,* অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী মান লা তাজুযু শাহাদাতুহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮৩।

৫৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : শাহাদাতু আহলিয-যিম্মাতি ফিল ওয়াসিয়্যাতি ফিস-সাকারি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯০।

৫৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী আন্নাল বায়্যিনাতা আলাল মুদ্দায়ী ওয়াল ইয়ামীনু আলাল মুদ্দা আলাইহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮৬।

অপর এক হাদীসে আলকামা ইবনে ওয়াইল র. সূত্রে বর্ণিত আছে, "হাযরামাওতের এক ব্যক্তি এবং কিন্দার এক ব্যক্তি নবী স. -এর কাছে আসে। হাযরামাওতের লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি আমার একখণ্ড জমি দখল করে নিয়েছে। কিন্দার লোকটি বললো, এতো আমার সম্পদ এবং তা আমার দখলেই আছে। এতে তার কোন স্বত্ব নেই। নবী স. হাযরামাওতের লোকটিকে বললেন : তোমার কোন সাক্ষী আছে কি? সে বললো, না। তখন তিনি বললেন, তবে তোমাকে তার শপথের উপর নির্ভর করতে হবে। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! এ লোকটি তো ফাসিক। কিসের শপথ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে তার কোন পরোয়া নেই, সে বিন্দুমাত্র ভীত হবে না। তিনি বললেন: এছাড়া তোমার আর কোন গত্যন্তর নেই। বর্ণনাকারী বলেন, কিন্দী শপথ করার জন্য এগিয়ে এলে রসূলুল্লাহ স. বললেন : সে যদি অন্যায়ভাবে তোমার সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে, তবে সে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, আল্লাহ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন"।[৬০]

**(চ) স্বীকারোক্তি**

মহানবী স.-এর যুগে বেশির ভাগ লোকই কৃত অপরাধ স্বীকার করতো এবং তিনি তাদের স্বীকারোক্তি স্বাভাবিক নিয়মের আওতায় গ্রহণ করতেন এবং তার ভিত্তিতে রায় প্রদান করতেন। যেমন মাইয আল-আসলামী ও গামিদীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৬১]

**(ছ) সরেযমীনে তদন্ত**

মহানবী স. তাঁর বিচার কার্যক্রমে অভিযুক্ত ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকতা যাচাই করতেন। মাইয আসলামীর ঘটনা থেকে তা বুঝা যায়, "সে যখন তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি কার্যকর করতে আহবান জানাল তখন নবী স. তার পরিবারের লোকদের ডাকালেন এবং তাদের কাছে খোঁজ খবর নিলেন যে, তার মাঝে কোন পাগলামী আছে কি-না? তারা বললো, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। নবী স. পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত, না অবিবাহিত? সে বললো, আমি বিবাহিত। অতঃপর নবী স. তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন"।[৬২]

**(জ) সন্দেহের সুযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তি ভোগ করতে পারে**

মহানবী স. সন্দেহযুক্ত অবস্থায় যতদূর সম্ভব মুসলিমদেরকে দণ্ড থেকে অব্যাহতি দিতেন। যেমন তিনি বলেছেন, "যতদূর সম্ভব তোমরা মুসলমানদের থেকে হদ্দ

---

[৬০]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-কাযা, অনুচ্ছেদ : শাহাদাতু আহলিয-যিম্মাতি ফিল ওয়াসিয়্যাতি ফিস-সাকারি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯০।

[৬১]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মান ই'তারাফা আলা নাকসিহি বিয-যিনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৭

[৬২]. প্রাগুক্ত

প্রতিহত করবে। যদি রেহাই দেয়ার কোন সুযোগ থাকে তবে তাকে তার পথে ছেড়ে দিবে। কারণ ইমামের (কর্তৃপক্ষের) ভুলবশত শাস্তি প্রদান করার চেয়ে ভুলবশত ক্ষমা করা উত্তম"।[৬৩]

**(ঝ) রায় ঘোষণা**

মহানবী স.-এর বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। যথা-

১. বিচারে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করা
২. বিচার শরী'আ ভিত্তিক হওয়া

মহানবী স. কুরআন মাজীদের আলোকে বিচার-ফয়সালা করতেন এবং তাঁর নিয়োগকৃত বিচারকগণও কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে রায় দিতেন। তবে কুরআন-সুন্নাহ'য় সরাসরি সমাধান না পাওয়া গেলে নিজস্ব মতামতের আলোকে সার্বিক দিক বিবেচনা করে রায় ঘোষণা করতেন। তারা কখনো শরী'আত-বিরোধী রায় ঘোষণা করতেন না। কেননা মহানবী স. বলেছেন, "আমি এমন ব্যক্তি নই যে, হালালকে হারাম করতে পারি এবং হারামকে হালাল করতে পারি"।[৬৪]

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয় এবং অধিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বিচারক তার রায় ঘোষণা করার পর রায় পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। মহানবী স.ও মাঝে মাঝে এরূপ করতেন। বর্ণিত আছে, "হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. এবং এক আনসার সাহাবী মহানবী স.-এর দরবারে একটি পানির নালা নিয়ে বিরোধ সম্পর্কিত বিষয় মীমাংসার জন্য আসে। তিনি প্রথমে রায় দিয়েছিলেন যে, যুবাইর রা. তার বাগানে পানি দেয়ার পর আনসার সাহাবীকে পানি ছেড়ে দিবেন। কিন্তু লোকটি পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন তুলে বলে, যুবাইর রা. নবী স. -এর আত্মীয় হওয়ায় তার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এতে নবী স. ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং ঐ ব্যক্তির আদালত অবমাননার শাস্তি স্বরূপ তিনি রায় পুনর্বিবেচনা করলেন এবং বললেন : হে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি দিবে এবং আইল বরাবর না হওয়া পর্যন্ত পানি আটকে রাখবে"।[৬৫]

এছাড়াও রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে রায়ের যৌক্তিকতা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পর্কে নবী স. সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রায় ঘোষণা করতেন না। তিনি বলেছেন, "দিবালোকের ন্যায় জ্ঞাত থাকলে তুমি সাক্ষ্য দিবে, অন্যথায় বিরত থাকবে"।[৬৬]

---

[৬৩]. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী দারয়িল হুদূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯৬।

[৬৪]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : মা ইউকরাহু আইয়ুযমাআ বাইনাহুন্না মিনান নিসায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭৫।

[৬৫]. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফির-রাজুলায়নি ইয়াকুনু আহাদাহুমা আসকানা মিনাল আখিরি ফিল-মায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮৮।

[৬৬]. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫৬।

বদর যুদ্ধে আফরার দুই পুত্র যথাক্রমে মুআয ও মুআওয়িয দাবি করে যে, তারা আবূ জাহলকে হত্যা করেছে এবং উভয়ে নিহতের সম্পদ দাবি করে। বিষয়টি নবী স.-এর দরবারে উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, তোমাদের উভয়ের তরবারি আমাকে দেখাও। মহানবী স. তা দেখে বললেন, এ ব্যক্তিই আবূ জাহলকে হত্যা করেছে, কারণ তার তরবারিতে রক্তের দাগ আছে। অতএব তাকেই তিনি আবূ জাহলের সম্পদ দান করেছিলেন।[৬৭]

**(ঞ) আপীলের অনুমতি**

মহানবী স.-এর বিচার প্রক্রিয়ায় আপীল করার অনুমতি ছিল। যেমন কোন আঞ্চলিক আদালতে ফয়সালাকৃত বিষয়ে কেউ কেউ সুপ্রিম কোর্ট তথা মহানবী স.-এর আদালতের দ্বারস্থ হতো।

ইমাম বায়হাকী র. বলেন, আলী রা. বলেছেন : "রসূলুল্লাহ্ স. আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। সেখানে এক সম্প্রদায় সিংহ শিকার করার উদ্দেশ্যে উঁচু ভূমিতে গর্ত খনন করলো এবং একটি সিংহ সেই গর্তে পতিত হলো। এক ব্যক্তি উক্ত গর্তে পড়ে গেল এবং সে আরেকটি লোককে ধরার কারণে সেও গর্তে পড়ে গেল এবং ধরাধরি করতে করতে আরো দু'জন গর্তে পড়ে তারা মোট চারজন হয়ে গেল। সিংহ তাদের আঘাত করায় তারা সবাই নিহত হলো। নিহতদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কূপ খননকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো। ফলে উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। আলী রা. বলেন, আমি তাদের কাছে এসে বললাম : তোমরা চার ব্যক্তির জন্য কি দুশো লোককে হত্যা করবে? তোমরা এসো, আমি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেই। তোমরা যদি সন্তুষ্ট থাকো, তবে এটাই তোমাদের জন্য ফয়সালা ধরে নিবে। আর যদি মানতে অস্বীকার করো, তবে তোমরা তা রসূল স.-এর দরবারে উত্থাপন করতে পারো। কেননা তিনিই বিচার-মীমাংসার ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেন : প্রথম ব্যক্তির জন্য দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ, তৃতীয় ব্যক্তির জন্য দিয়াতের অর্ধেক এবং চতুর্থ ব্যক্তির জন্য পূর্ণ দিয়াত। তিনি ঐ দিয়াত ঐ চার গোত্রের উপর ধার্য করেন যারা গর্তের কিনারায় উপস্থিত হয়েছিল। এ ফয়সালায় তাদের কেউ অসন্তুষ্ট হলো এবং কেউ সন্তুষ্ট হলো। অতঃপর তারা নবী স.-এর দরবারে এলো এবং ঘটনাটি তাঁর কাছে বর্ণনা করলো। তিনি বলেন, আমি তোমাদের মাঝে বিষয়টি ফয়সালা করে দিবো। একজন বললো, আলী রা. আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন এবং সে আলী রা.-এর ফয়সালা তাঁর নিকট বর্ণনা করলো। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন: আলী যা ফয়সালা করেছে সেটাই যথার্থ"।[৬৮]

---

৬৭. ইবনে ফারহুন, *তাবসিরাতুল হুককাম ফী উসূলিল আকযিয়াতি ওয়া মানাহীজিল আহকাম*, তা.বি, ১৯৯৫, খ. ২, পৃ. ২২১।

৬৮. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ৭৫।

এভাবে মহানবী স. উচ্চ আদালতে নিম্ন আদালতের রায় পর্যালোচনা করে বহাল রাখতেন অথবা বাতিল করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, "নবী স. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রা.-কে বনূ জাযিমার বিরুদ্ধে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিলে তারা বললো, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ রা. আমাদের কতককে এমর্মে আদেশ দিলেন যে, আমরা যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করি। আমি বললামঃ আল্লাহর শপথ! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না এবং আমাদের সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না (কারণ বিষয়টি সন্দেহযুক্ত)। অবশেষে আমরা নবী স.-এর দরবারে ফিরে এলাম এবং বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। নবী স. দু'হাত তুলে বললেন : 'হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে মুক্ত'। একথাটি তিনি দু'বার বললেন"।[৬৯]

মোটকথা মহানবী স. তাঁর বিচার কার্যক্রমে আপিল করার সুযোগ রেখেছিলেন। তবে তিনি কখনো নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখতেন, আবার কখনো তা বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে রায় প্রদান করতেন কিংবা নিম্ন আদালতের রায়কে বাতিল ঘোষণা করতেন।

**(ট) রায় কার্যকরকরণ**

১. শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে বাদীকে এখতিয়ারদান
২. তাওবার আহবান
৩. বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি কার্যকরকরণ
৪. শাস্তি প্রয়োগ না করার সুপারিশ নিষিদ্ধকরণ

১. মহানবী স. কখনো কখনো অপরাধীকে 'বিশেষত হত্যার প্রতিশোধের ক্ষেত্রে' বাদীর নিকট সোপর্দ করে বলতেন, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে তাকে নিহতের অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে অন্যথায় ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে"।[৭০]

আবূ হুরায়রা রা. বলেন, "রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি নিহত হলে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। হত্যাকারী বললো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ! আমি তাকে হত্যা করতে চাইনি। রসূলুল্লাহ স. বললেন :

---

৬৯. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় :আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ ; ইযা কাযাল হাকিমু বি-জাওরিন আও খিলাফি আহলিল ইলম ফাহুয়া রাদ্দুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৯।

৭০. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী,* অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিদ-দিয়াতি কাম হিয়া মিনাল ইবিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯২।

সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে এবং তাকে যদি এমতাবস্থায় তোমরা হত্যা করো, তবে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন তারা হত্যাকারীকে ছেড়ে দিলো"।[৭১]

উল্লেখ্য যে, মহানবী স. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শরয়ী শাস্তি থেকে মুক্তিদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন এবং কোন যৌক্তিক পথ আছে কি না সেজন্য তিনি বারবার বলতেন, "হদ্দ থেকে মুক্তিদানের কোন সুযোগ থাকলে তোমরা হদ্দ প্রতিহত করো"।[৭২]

২. কোন কোন ক্ষেত্রে মহানবী স. অপরাধীকে তাওবা করার আহবান জানাতেন। আবূ উমায়্যা আল-মাখযূমী রা. বলেন, নবী স.-এর দরবারে একটি চোর আনা হলো। সে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে চুরির অপরাধ স্বীকার করলো। কিন্তু তার কাছে চুরিকৃত কোন দ্রব্য পাওয়া গেল না। নবী স. তাকে বললেন : তোমার ভাইয়ের মাল তুমি চুরি করলে? সে বললো : হ্যাঁ। নবী স. তাঁর কথা এভাবে দুই কিংবা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশে লোকটির হাত কাটা হলো। এরপর তাকে নবী স. -এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে বললেন : তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো। সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি। বর্ণনাকারী বলেন, অন্তত নবী স. তিনবার বললেন : হে আল্লাহ! তুমি তার তাওবা কবুল করো"।[৭৩]

৩. মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ পৃথক ছিল না এবং প্রয়োজন ও ছিল না। সুতরাং তিনি বিচারক হিসেবে রায় প্রদান করে প্রধান নির্বাহী হিসেবে বিচারের রায় কার্যকর করতেন। তিনি যে কয় প্রকারের শাস্তি কার্যকর করেছিলেন তার কয়েকটির উদাহরণ নিম্নরূপ :

**মৃত্যুদণ্ড** ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক দিয়াত গ্রহণে অসম্মত হলে কিংবা অভিভাবক না থাকলে নবী স. মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেন। বর্ণিত আছে যে, "তিনি ব্যভিচারের অপরাধে এক মহিলাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন, এমনকি তিনি নিজেও পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন"।[৭৪]

**হস্তকর্তন** ঃ এই শাস্তি কেবল চুরি ও ডাকাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নবী স.-এর জীবদ্দশায় যে সমস্ত চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে সকল ঘটনায় চোর ধরা পড়লে

---

[৭১]. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, অধ্যায় : আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী হুকমি ওয়ালিয়্যিল কাতীল ফিল-কিয়াস ওয়াল আফবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯৪।

[৭২]. ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : আস-সাতরুল মুমিন ওয়া দাফয়িল হুদূদ বিশ-শুবহাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২৯

[৭৩]. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : কাতউস সারিক, অনুচ্ছেদ : তালকীনুস-সারিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০৩।

[৭৪]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ ; ফী রাজমিল ইয়াহূদিইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪৯।

এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিতেন এবং সে রায় কার্যকর করা হতো। হাদীসে উল্লেখ আছে, "জাবির রা. বলেন, একবার এক মাখযুমী মহিলা চুরি করলো। অতঃপর সে নবী সহধর্মিনী উম্মে সালামা রা.-এর মাধ্যমে নবী স.-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। নবী স. বললেন, যদি ফতিমাও চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর মহিলাটির হাত কেটে ফেলা হলো"।[৭৫]

**বেত্রাঘাত ও নির্বাসন ঃ** অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে নবী স. তাকে একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসনের শাস্তি দিতেন। এছাড়া তিনি নেশাগ্রস্তকে আশিটি বেত্রাঘাত কিংবা জুতা দ্বারা চল্লিশটি আঘাত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭৬]

**অন্তরীণ বা আটক ঃ** মহানবী স. প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট জেলখানা ছিল না। তবে তিনি কখনো কখনো অপরাধীকে মসজিদের পাশে আটক করে রাখতেন। যেমন সুমামা ইবনে উসাল নবী স.-কে হত্যার উদ্দেশ্যে মদীনায় এসেছিল। সেমতে তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে তিন দিন বেঁধে রাখা হয়েছিল।[৭৭]

এছাড়া সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে মহানবী স. তাকে সার্বক্ষণিক নজরে রাখার জন্য ঋণদাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা এক ধরনের নজরবন্দী। অনুরূপভাবে যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখার অনুমতি বা নির্দেশ মহানবী স.-এর বিচারব্যবস্থায় ছিলো। যেমন, কুর'আন মাজীদে এসেছে ঃ "তবে তাদেরকে ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখবে, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়"।[৭৮]

**শাস্তি প্রয়োগ না করার জন্য সুপারিশ নিষিদ্ধ**

মহানবী স. ছিলেন একাধারে করুণার আধার এবং অপরদিকে ছিলেন ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠতম নমুনা। কাজেই যখন তিনি বিচার কার্যক্রম চূড়ান্ত করতেন তখন শাস্তি প্রয়োগের সময় কোন প্রকার সুপারিশ গ্রহণ করতেন না। যেমন মাখযূম গোত্রের এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়লে তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ ছিলেন। তাঁর কাছে শাস্তি মওকূফ করার জন্য সুপারিশ করা হলে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সুপারিশকারীকে বললেন : "তুমি আমার কাছে আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দসমূহের কোন একটি হদ্দ মওকূফের সুপারিশ করছো?[৭৯]

---

[৭৫]. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : কাতউস-সরিকিশ শারীফ ওয়া গায়রিহি ওয়ান নাহয়ি আনিশ শাফাআত ফিল-হুদূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭৭।

[৭৬]. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী,* অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী হাদ্দিস-সুকরান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯৮

[৭৭]. ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আল-ইগতিসালু ইযা আসলামা ওয়া রাবাতাল আসীর আয়যান ফিল-মাসজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[৭৮]. আল-কুরআন, ৪: ১৫।

[৭৯]. ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী,* অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী কারাহিয়াতি আন ইয়াশফাআ ফিল হুদূদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯৭।

মহানবী স.-এর বক্তব্য ছিল, অপরাধীকে ক্ষমা করতে হলে আমার কাছে মোকদ্দমা উপস্থাপন করার পূর্বেই ক্ষমা করো। তিনি বলেছেন, "হদ্দ আরোপিত হতে পারে এ ধরনের অপরাধ তোমাদের নিজেদের মধ্যে আপোসে ক্ষমা করো। কিন্তু যা হদ্দ হিসাবে আমার কাছে পৌঁছেছে তা অবধারিত হয়ে গেছে"।[৮০]

একদা নবী স.-এর কাছে এক চোরকে ধরে আনা হলে তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দেন এবং কাঁদতে থাকেন। তাকে বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কাঁদছেন? তিনি বললেন : কেন কাঁদব না! তোমাদের সামনে আমার উম্মাতের হাত কাটা হচ্ছে। সাহাবাগণ বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন না? তিনি বললেন, "নিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আরোপিত হদ্দসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছে"।[৮১]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী স.-এর প্রধান লক্ষ ছিল মানুষের সংশোধন, ধ্বংস কিংবা শাস্তিদান নয়। তবে যে শাস্তি তিনি কার্যকর করেছিলেন তা ছিল মূলত সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান এবং জালিমের নিকট থেকে মজলুমের অধিকার আদায় করে দেয়ার জন্য।

### খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিচারব্যবস্থা

খুলাফায়ে রাশেদীন তাঁদের আমলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা নিম্নরূপ -

### আবু বকর রা.-এর ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত

মহানবী স.-এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনে যারা আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন মালিক ইবনে নুয়ায়রা তাদের অন্যতম। তাকে গ্রেফতার করে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. (মৃ. ২১হি:/৬৩১ খ্রি.)-এর নিকট পেশ করা হয়। তিনি তার সাথে কথা বলার সময় মহানবী স.-এর ব্যাপারে তার বিরূপ শব্দ চয়ন করতে শোনতে পান। সে সময় খালিদ রা.-এর নির্দেশে যিরার ইবনে আযওয়ার রা. তাকে হত্যা করেন। নুয়ায়রার হত্যার ব্যাপারে আবু কাতাদা ও উমর রা. ভিন্নমত পোষণ করে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-এর বিচার দাবি করেন। আবু বকর রা. উভয় পক্ষের কথা শুনে এমর্মে ফয়সালা দেন যে, যুদ্ধনীতি দৃষ্টে খালিদের ক্ষেত্রে কিসাস ও বরখাস্ত কোনটাই প্রযোজ্য নয়। তিনি বায়তুলমাল থেকে মালিক ইবনে নুয়ায়রার রক্তপণ আদায় করে দেন। এ ঘটনা থেকে ইসলামের শত্রুদের ব্যাপারে সুবিচার কায়েমের ক্ষেত্রেও আবু বকর রা.-এর সতর্কতার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।[৮২]

---

৮০. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : ইউফি আনিল হুদূদ মা-লাম তাবলীগিস-সুলতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪২

৮১. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, আল-কাহেরা : মাতবাআতুস সাআদাহ, খ. ১২, পৃ. ৮৯-৯০।

৮২. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, বাংলা মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও অন্যান্য, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, খ. ১, পৃ. ২৮১।

**উমর রা.-এর ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত**

মুজাহিদ র. বলেন, একদিন আমরা ইবনে আব্বাস রা. -এর মজলিসে বসে আবু বকর ও উমর রা. -এর ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। ইবনে আব্বাস রা. যখন উমর রা.-এর আলোচনা শুনতে পেলেন তখন এত বেশি কাঁদলেন যে, তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি কুরআন পড়তেন, আমল করতেন এবং আল্লাহর নির্দেশিত দণ্ডবিধি কার্যকর করে গেছেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করতেন না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তিনি দণ্ড কার্যকর করতে গিয়ে তাঁর ছেলেকে মেরেই ফেলেছেন। তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর রসূলের চাচাত ভাই! ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ দিন। তিনি বললেন, আমি একদিন মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। তখন আরো কতিপয় লোক উমর রা.-এর মজলিসে বসা ছিল। এ সময় এক যুবতী এসে বলল, "আস্সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন।" তিনি জবাবে বললেন, ওয়া আলাইকিস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কিছু বলার আছে কি? সে বলল, হাঁ, আমার পেটে জন্ম নেয়া এ বাচ্চাটি আপনার। তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে চিনিই না। একথা শুনে যুবতী কেঁদে ফেলল এবং বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! সন্তানটি আপনার ঔরসজাত নয় বটে, তবে আপনার ছেলের ঔরসজাত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হালাল পথে, না হারাম পথে? সে বলল, আমার পক্ষ থেকে হালাল পথে কিন্তু তার পক্ষ থেকে হারাম পথে। তিনি বললেন, সেটা কীভাবে? আল্লাহকে ভয় করে সত্য কথা বল। সে বলল, আমীরুল মুমিনীন! বেশ কিছু দিন পূর্বে আমি একদিন বনী নাজ্জারের এক বাগানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আপনার ছেলে আবু শাহমা মদ্যপ অবস্থায় আমার কাছে আসে। ইয়াহূদীদের খপ্পরে পড়ে সে মদ পান করেছিল। সে আমার সাথে তার কামনা চরিতার্থের প্রস্তাব দিল এবং আমাকে বাগানে টেনে নিয়ে তার কামনা চরিতার্থ করলো। আমি অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। আমি এ ঘটনা আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে গোপন রেখেছিলাম। এক সময় বাচ্চার অস্তিত্ব আঁচ করতে পেরে অন্যত্র চলে গেলাম। সেখানে আমার এ শিশুটি জন্ম নিয়েছে। আমি শিশুটিকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তাই আপনি আমার ও তার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশিত ফয়সালা কার্যকর করুন"।

খলীফা উমর রা. তৎক্ষণাৎ ঘোষককে লোক জমায়েত করার নির্দেশ দিলেন। লোকজন মসজিদ প্রাঙ্গণে একত্র হলো। তিনি বললেন, আপনারা থাকুন, আমি এক্ষুণি আসছি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার সাথে এসো। তিনি ঘরে গিয়ে হুংকার ছেড়ে বললেন, আবু শাহমা কি ঘরে আছে? তাঁকে জানানো হল, সে আহার করছে। তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, হে আমার সন্তান! খানা খেয়ে নাও, সম্ভবত এটাই তোমার শেষ খাবার।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি দেখলাম সাথে সাথে আবু শাহমার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং কাঁপতে কাঁপতে তার হাতের গ্লাস মাটিতে পড়ে গেল। উমর রা. বললেন, হে আমার সন্তান! বল তো আমি কে? সে বলল, আপনি আমার পিতা ও আমীরুল মুমিনীন। তিনি বললেন, আমার কি তোমার আনুগত্য লাভের অধিকার আছে? সে বলল, হাঁ, আপনি দ্বিবিধ আনুগত্য লাভের অধিকারী- একটি হল পিতা হিসেবে ও অপরটি হল আমীরুল মুমিনীন হিসেবে। তিনি বললেন, তোমার নবী ও তোমার পিতার দাবির প্রেক্ষিতে এখন বল, তুমি কি ইয়াহূদীদের খপ্পরে পড়ে মদ পান করেছ? সে বলল, হাঁ, তবে আমি তাওবা করেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রিয় সন্তান! আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি বনী নাজ্জারের বাগানে গিয়েছিলে এবং এক যুবতীর সাথে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিলে? এ প্রশ্ন শুনে আবু শাহমা চুপ হয়ে গেল ও কাঁদতে লাগলো। তিনি বললেন, হে বৎস! লজ্জার কিছু নেই, সত্য কথা বলো। আল্লাহ সত্যবাদীকে ভালোবাসেন। সে বলল, হাঁ, আমার দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছে এবং আমি সেজন্য তাওবাও করেছি। উমর রা. তাঁর জবাব শুনে জামা ধরে টেনে হিঁচড়ে মসজিদের চত্বরে নিয়ে আসলেন। আবু শাহমা তখন কেঁদে বলল, হে আমার পিতা! তরবারি দিয়ে আমাকে দুই টুকরা করে ফেলুন, জনসমক্ষে নিয়ে আমাকে লজ্জা দিবেন না। তিনি বললেন, তুমি কি এই আয়াত পাঠ করনি ঃ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ "মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে"।

অতঃপর তিনি তাকে টেনে নিয়ে মসজিদে নববীর চত্বরে নবী স.-এর সাহাবীদের সামনে হাযির করে বললেন, যুবতী সত্য কথা বলেছে এবং আবু শাহমা তা স্বীকার করেছে। অত:পর তাঁর গোলাম আফলাহকে বললেন, একে শক্ত হাতে ধরো ও কঠোরভাবে কশাঘাত করো এবং এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না। আফলাহ আপারগতা প্রকাশ করলো। তিনি বললেন, আফলাহ! আমার আনুগত্য মানে রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য। কাজেই যা নির্দেশ তাই কার্যকর করো।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, উমর রা. তার ছেলে আবু শাহমার জামা খোলালেন। এদৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আবু শাহমা কাতর কণ্ঠে বললেন, হে পিতা! আমার উপর অনুগ্রহ করুন। একথা শুনে উমর রা.ও কেঁদে কেঁদে বললেন, তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি রহম করুন। আমি তোমার উপর দণ্ড এজন্য কার্যকর করছি যেন আমাদের প্রতিপালক তোমার ও আমার উপর রহম করেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আফলাহ! কশাঘাত শুরু করো। সে চাবুক মারা শুরু করলো। আবু শাহমা কাতরাতে থাকলো। আফলাহ যখন সত্তরটি চাবুক মারলো তখন আবু শাহমা বলল, হে আমার পিতা! আমাকে এক ঢোক পানি পান করান। তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! যদি আল্লাহ তোমাকে পবিত্র করেন তাহলে মহানবী

স. তোমাকে হাউজে কাওসারের পানি পান করাবেন। তারপর তুমি আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। অতঃপর তিনি বললেন, হে আফলাহ! পেটাতে থাক। যখন আশিটি চাবুক মারলো তখন আবু শাহমা বলল, হে আমার পিতা! আসসালামু আলাইকা। তিনি বললেন, ওয়া আলাইকাস-সালাম। তোমার সাথে যদি মুহাম্মদ স.-এর সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাঁকে সালাম জানিয়ে বলবে, আমি আমার পিতাকে কুরআন পড়তে, আমল করতে ও দণ্ড কার্যকর করতে দেখেছি। অতঃপর বললেন, হে আফলাহ! চাবুক মারতে থাক। যখন নব্বইটি চাবুক মারা হল তখন আবু শাহমার শরীর নিস্তেজ হয়ে গেলো।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি দেখতে পেলাম, নবী স.-এর সাহাবীগণ সমস্বরে উমর রা.-কে বললেন, এখন যে চাবুকগুলো অবশিষ্ট আছে তা পরে মারুন। তিনি বললেন, পাপের কাজে যখন বিলম্ব করা হয়নি তখন দণ্ডদানে বিলম্ব করা হবে কেন? তখন আবু শাহমার মায়ের কাছে কেউ গিয়ে তার অবস্থা জানালো। সাথে সাথে তিনি কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এসে বললেন, অবশিষ্ট চাবুকগুলোর প্রত্যেকটির পরিবর্তে আমি পায়ে হেঁটে একটি করে হজ্জ করবো এবং এত পরিমাণ দান-খয়রাত করবো। উমর রা. বললেন, হজ্জ ও দান খয়রাত দণ্ডের বিনিময় হয় না। আফলাহকে বললেন, সবগুলো চাবুক মারো। যখন শেষ চাবুকটি মারা হল, আবু শাহমা সাথে সাথে চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। উমর রা. তখন তার মাথা নিজের কোলে রেখে কেঁদে কেঁদে বললেন, আমার পিতা উৎসর্গিত হোন। সত্যের জন্য তোমার মৃত্যু হলো। তুমি শেষ দণ্ডটি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছ। তোমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি তোমার পিতাও তোমাকে রক্ষা করতে পারলো না। দণ্ড শেষে সবাই দেখল, তার প্রাণ বায়ু চলে গেছে। এটা ছিল বড্ড কঠিন দিন। লোকেরা বুক চাপড়িয়ে কাঁদছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, চল্লিশ দিন পর হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. কোন এক জুমুআর দিন সকালে এসে আমাদের জানান, আমি আজ স্বপ্নে রসূল স. ও আবু শাহমাকে একত্রে হাঁটতে দেখেছি। তার পরিধানে তখন দুটো সবুজ জুব্বা শোভা পাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ স. আমাকে বলেছিলেন, উমরকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবে, এভাবেই আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে যে, "তোমরা কুরআন পড়বে ও তার দণ্ড কায়েম করবে"। অতঃপর আবু শাহমা আমাকে বলল, হে হুযাইফা! আমার পিতার কাছে সালাম পৌঁছিয়ে বলবে, আল্লাহ তাঁকে যেন ঐভাবে পবিত্র রাখেন, যেভাবে তিনি আমাকে পবিত্র করেছেন।[৮৩]

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন বলেন, খলীফা উমর রা.-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করেন এবং সর্বত্র ন্যায় বিচার নিশ্চিত করেন।[৮৪]

---

[৮৩]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলাভী, *ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা*, দিল্লী, তা. বি. খ. ২, পৃ. ৩০-৩২।
[৮৪]. আবদুর রহমান ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দমা*, বৈরূত : দারুল হাদীস, ২০০০, পৃ. ২২১।

খলীফা উমর রা. যখন কাউকে কোথাও বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতেন, তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, তারা যেন লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার কায়েম করেন, জ্ঞান খাটিয়ে রায় দেন এবং উভয় পক্ষের মতামত শুনে ফয়সালা দেন। তিনি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষে কখনো কখনো পত্র লিখতেন। যেমন মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আ'স রা.-এর প্রতি পত্র লিখেন; ন্যায়বিচার না করায় কখনো বিচারকদের পদচ্যুত করতেন যেমন- আবু মরিয়ম হানাফীকে কূফার বিচারক পদ থেকে পদচ্যুত করেন।[৮৫]

কখনো কখনো তিনি ক্ষমতা রহিত করে স্বপদে বহাল রাখতেন। যেমন- উবাদা ইবনে সামিত ইস্যুতে তিনি মু'আবিয়া রা.-এর ব্যাপারে করেছিলেন। ইবনে আবদুল বার্র র. বলেন, ইমাম আওযায়ী র. বলেছেন: উবাদা ইবনে সামিত রা. ফিলিস্তীনের বিচারক ও গভর্নর ছিলেন। মু'আবিয়া রা. কোন এক ব্যাপারে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং বিরোধিতা করেন। উবাদা রা. তাকে বললেন, আমি আপনার সাথে এক ভূখণ্ডে থাকবো না-এ কথা বলে তিনি মদীনায় চলে আসেন। উমর রা. তাঁর মদীনায় ফিরে আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা অবহিত করেন। তিনি তাকে পুনরায় ফিলিস্তীনে প্রেরণকালে বললেন, যে ভূখণ্ডে তুমি থাকবে না তাদের আল্লাহ নিপাত করুন, কারণ ঐ ভূখণ্ডে তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। অতঃপর তিনি মু'আবিয়া রা.-এর নিকট পত্র লিখেন।

তিনি বিচারপতি শুরাইহ র. -এর উদ্দেশ্যে লিখেন ঃ "তোমার কাছে যখন কোন বিষয় (মোকদ্দমা) উপস্থিত হয় তখন তুমি সর্বাগ্রে দেখবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনে কী আছে এবং সে মুতাবিক বিচার-ফয়সালা করবে। আর যদি তাতে কিছু না পাও তাহলে দেখবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রসূলুল্লাহ স. কীভাবে ফয়সালা করতেন তা দেখে নিবে এবং তদনুযায়ী ফয়সালা দিবে। ইচ্ছা করলে তুমি আমার সাথে পরামর্শ করে নিতে পারো। আর পরামর্শ করে নেয়ার ভেতরই আমি কল্যাণ দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তোমার প্রতি শান্তি নাযিল করুন"।[৮৬]

### আলী রা.-এর ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত

বর্ণিত আছে যে, একবার এক ইয়াহূদী খলীফা আলী রা.-এর লৌহবর্ম চুরি করে নিয়ে যায়। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি এ ব্যাপারে কোন পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না বরং প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আদালতে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন। আদালতের বিচারক তাঁকে অভিযোগের সপক্ষে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। খলীফা আলী রা. তাঁর দু'পুত্র ইমাম হাসান ও

---

৮৫. মুহাম্মদ ইবনে খালাফ আল-ওয়াকী, *আখবারুল কুযাত*, বৈরূত : তা. বি. খ. ১, পৃ. ২৭০।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

ইমাম হুসাইন রা.-কে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করলেন। কিন্তু বিচারক অভিযোগকারীর নিকটাত্মীয় বলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করে বরং মামলাটি খারিজ করে দিলেন। এদিকে ইয়াহূদী নিজেই তার কৃত অপরাধ স্বীকার করে এবং কালিমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করে।[৮৭]

মোটকথা, বিশ্ব ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামল মডেল হিসাবে স্বীকৃত। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় যদি আজও তাঁদের অনুসৃত নীতিমালা ও প্রশাসন কায়েম করা যায় তাহলে অশান্ত এই পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

### উপসংহার

আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্বমানবতার ইহকালীন জীবনে শান্তি ও পরকালীন জীবনে মুক্তির লক্ষে বিভিন্ন সময়ে আসমানী কিতাবসহ অসংখ্য নবী-রসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরিত হন মহানবী স.। তাঁর আনীত আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। সেই হিসেবে তাঁর আদর্শ পালন বিশ্বমানবতার উপর অপরিহার্য। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববাসী লক্ষ করছে, কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাক বরং দিনের পর দিন ন্যায়বিচারের পরিবর্তে অবিচার যেন বিশ্বমানবতাকে গ্রাস করে ফেলছে। এমতাবস্থায় বিশ্ববাসী যদি আল্লাহ্ প্রদত্ত ও মহানবী স. প্রদর্শিত পথে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে পারে তাহলে আশা করা যায় বর্তমান বিশ্বে পুনরায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

[৮৭]. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৭২।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩০
এপ্রিল-জুন : ২০১২

# প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক বাংলায় ভূমির মালিকানা : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান*

*[সারসংক্ষেপ : ভূমির ইতিহাস সুপ্রাচীন। কৃষি প্রধান সভ্যতায় ভূমি ব্যবস্থা সমাজ বিন্যাসের গোড়ার কথা। কৃষি ভূমি নির্ভর; কাজেই ভূমি ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণী বিন্যাস, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অথবা সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের ভূমির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দায় ও অধিকার। প্রাচীন যুগে ভূমির ব্যাপকতায় মূল মালিক কে ছিল তা নিয়ে ইতিহাসবেত্তাদের মাঝে রয়েছে ব্যাপক মতপার্থক্য। মধ্যযুগে এসেও মতপার্থক্য দূর হয়নি। একদল ঐতিহাসিক প্রজা বা রায়তকে ভূমির মালিক বলে মনে করতেন। অপর একদল রাজা বা রাষ্ট্রকে ভূমির মালিক বলে মনে করতেন। আধুনিক যুগের শুরুতে জমিদার বা অন্যবিধ মধ্যস্বত্বের অধিকারীদের ভূমির মালিক মনে করা হতো। তবে সময়ের ব্যবধানে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ঘটে, যার ধারাবাহিকতা আজও বিরাজমান।]*

## প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগ বলতে মূলত প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন হিন্দু রাজা ও রাজবংশের বিশেষ করে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে বুঝায়।[১] প্রাচীন বাংলায় ভূমির প্রকৃত মালিক কে ছিল–তা নিয়ে ঐতিহাসিক ও পন্ডিতদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অভিমত পাওয়া যায়।[২] এ প্রসঙ্গে ড. নীহার রঞ্জন রায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায়, "ভূমির যথার্থ মূল অধিকারী রাজা না জনসাধারণ, এ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে, অতীতকালেও হয়েছে, আধুনিককালেও হচ্ছে। ভারতবর্ষে হয়েছে, ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশেও হয়েছে। কাজেই এ বিতর্কের

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আলাতুননিসা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা।

১. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা,* ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ১১

২. The question of ownership of land in ancient India has become a matter of keen controversy with the Ideologists. A mass of literature has accumulated and theories have been put forward by the scholars as to the different types of ownership of land in ancient India'. (Dr.Narendra Nath Kher, *The Agrarian and Fiscal Economy in the Mauryan and post-Maureen Age,* (Cir.324 BC-320 AD), Motilal Banarsidass : 1973, p.27).

মধ্যে ঢুকে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। ভূমির মূল অধিকারী কে, এই প্রশ্ন নিয়ে যত তর্কই থাকুক তা জিজ্ঞাসুমনের অনুসন্ধান মাত্র, ঐতিহাসিক যুগে ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নাও থাকতে পারে। ভূমি-স্বত্বের অধিকারী হচ্ছেন কে, এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই ঐতিহাসিকের বিরোধ মিটে যায়। যুক্তির দিক হতে ভূমির অধিকারী কে ছিলেন, তা জানার কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু মূল অধিকারী যিনি বা যারাই হোন বাস্তবতার আলোকে তিনি বা তারাই যে ভূমির স্বত্বাধিকারী হবেন এমন না-ও হতে পারে"।[৩]

প্রাচীন বাংলায় সমাজ বিবর্তনের ধারায় যখন জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম এবং চাষাবাদের ভূমি ছিল প্রচুর, যে যেখানে বন-জঙ্গল ইত্যাদি আবাদ পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন ও দখল করত, তখন সেটাই হতো তার মালিকানাধীন ভূমি। ড. অজয় রায় বলেন, "অতি প্রাচীনকালে জমি নিয়ে, জমির মালিকানা নিয়ে কোন ল্যাঠা ছিল না যে তা বোঝা যায়। জমির মালিকানা ছিল যৌথ, চাষ-বাস ছিল অনুন্নত। যাদের যে রকম জমির প্রয়োজন পড়ত জঙ্গল কেটে ততটুকু জমি অর্জন করে নিত"।[৪] এ সময় সমাজপতিরা সমাজের উন্নয়ন, শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের নামে ভূমির মালিকদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন।[৫] সময়ের বিবর্তনে রাষ্ট্রের রাজা রাষ্ট্র পরিচালনার সুবাদে নিজেকে দেশের ভূ সম্পত্তির মালিক বলে দাবি করতেন।[৬] ভূমির মালিক রাজা না প্রজা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেন, "ভূমি কার-রাজার কী প্রজার- তা নিয়ে মানব সমাজে অনেক কলহ বিবাদ হয়ে গেছে। ভারত বর্ষে রাজা ভূমির প্রতিপালক (রক্ষাকর্তা) বলে প্রতিভাত। শষ্য উৎপন্ন হোক বা না হোক ভূমি অধিকার করতে হলে প্রজাকে নির্দিষ্ট কর প্রদান করতে হবে, এরূপ শাসননীতি রাজাকে ভূমির অধিকারী বলে প্রতিপন্ন করে। প্রজা তা স্বীকার করে নিয়ে ভূমি কর্ষণ করে; তদ্বারা ভূমিতে স্বামিত্ব লাভ করতে পারে না।[৭]

ভারতবর্ষ তথা বাংলার ভূমি ব্যবস্থার মালিকানা ও স্বত্ব সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনা আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনটি মতের জন্ম দিয়েছে।[৮] তাহলো-

---

[৩]. ড.নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস ঃ আদিপর্ব*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ.২০০।

[৪]. ড. অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ.৮০।

[৫]. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

[৬]. ড. নীহাররঞ্জন, রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-১

[৭]. ড. তাপস, বসু, বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, ঢাকা : পুস্তক বিপণি, বৈশাখ ১৪০০, পৃ. ২৪

[৮]. Mainly,there are three schools of scholars'.Dr. Md. Aquique, Economic History of Mithila (C.600B.C.to1097A.D), Delhi : Abhinav publications, 1974, p.32

১. প্রথম দলের মতে প্রাচীনকালে ভূমির-মালিকানা-স্বত্ব ছিল রাজার। ভূমির উপর তারই ছিল একচ্ছত্র অধিকার। এ দলের প্রবক্তাদের মধ্যে ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ; হপকিন্স; ইউ. এন. ঘোষাল; ডি. ডি. কোসাম্বী; জে. এন. সমদ্দার; এস. কে. মাইতী; ঈশ্বরী প্রাসাদ; বুহলার; ব্রেলোয়ার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তরকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও ইউয়ান-চোয়াঙও তাদের বিবরণে লিখেন, ভারতবর্ষে ভূমি রাজার সম্পত্তি ছিল।[৯]

২. দ্বিতীয় দল তথা গ্রাম সমবায়ের প্রবক্তাদের গুরু হচ্ছেন ঐতিহাসিক স্যার হেনরী মেইন।[১০] তার মতের সমর্থকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ড.রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. এ. এস. আলতেকর, ড. রাধা কমল মুখার্জী প্রমুখ। প্রবক্তাদের মধ্যে ড. এ. আর. দেশাই বলেন, "ভূমি রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হতো না। আইনগত অধিকার বলে হোক বা না হোক প্রকৃত প্রভাবে গ্রাম সমাজই ছিল গ্রামের জমির মালিক।"[১১]

ড. রাধাকমল মুখার্জীও প্রায় অনুরূপ কথা বলেছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Land problems in India'-তে তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ-পূর্বযুগে' ভারতে জমির মালিক ছিল পল্লীবাসী উপজাতি সম্প্রদায় বা সামাজিক গোষ্ঠী-ভারতে জমি কোনদিন রাজার সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়নি।...সামন্ত-প্রভু বা সম্রাট এই দু' এর কারো আমলেই কৃষক ছাড়া আর কারোর জমির উপর মালিকানা স্বত্ব ছিল না।[১২]

৩. তৃতীয় দলের বিবেচনায় আসে ভূমিতে প্রাচীনকাল থেকে আবাদ, কর্ষণ ও বসতিস্থাপনের সঙ্গে যাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সেই কৃষক-প্রজাকুলের তথা ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্ন। মি. জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, "Land throughout India is generally private property, subject to the payment of revenue, the mode and system of assessment differing materially in various parts."[১৩]

---

৯. ড. রামশরণ শর্মা, *ভারতের সামন্ততন্ত্র, (দ্বাদশ হতে চতুর্দশ শতাব্দী)*, (অনুঃ শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায়), কলকাতা : কে পি বাগচী এন্ড কোং, ১৯৮৫, পৃ.১১৯।

১০. মেইন বলেন, "the oldest discoverable forms of property in land were forms of collective property and separate property has grown out of collective property of ownership in common." (Quoted from, Dr. RadhaRomon Mookerjee, *History and Incidents of Occupancy Right*, Delhi : Neeraj Publishing House, 1987, p.13.

১১. ড.এ.আর. দেশাই, *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*, (অনুঃ মনস্বিতা স্যানাল), কলকাতা : কে পি বাগচী এন্ড কোং, ১৯৯২, পৃ.৩৩-৩৪।

১২. উদ্ধৃতি সংগ্রহ,'রাজা রামমোহন, ড.কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য, *বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি'* কলকাতা : বর্ণপরিচয়, ১৯৯২, পৃ.২৮।

১৩. Quoted from Romesh C. Dutt, *`Famines and land Assessments in India'*, Delhi : BR Publishing Corporation, 1985, p.180.

ড. আবদুল্লাহ ফারুক বলেন, "প্রাচীনকালে কৃষকই ছিল জমির প্রকৃত মালিক–রাজা শুধু নির্দিষ্ট রাজস্বের অধিকারী ছিল"।[১৪] এই মতের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে স্যার ব্যাডেন পাওয়েল; কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল; পি. ভি. কেন; রাধারমণ মুখার্জী; পি. এন. ব্যানার্জী, নারায়ণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়; মুহম্মদ আকিক প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৫] কেউ কেউ যেমন ড. গ্রোভার, ড. রামশরণ শর্মা এই তিনটি মতকে একত্রীকৃত করার চেষ্টাও করেছেন।[১৬] তবে বাংলা ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য উপরিউক্ত তিনটি মতের বিশেষ করে প্রথম এবং তৃতীয়টির কোনটি প্রচলিত ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা না গেলেও এ কথা বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় বিশেষ করে গুপ্ত যুগে সমুদয় ভূমির মূল মালিক ছিল রাজা বা রাষ্ট্র। during the Gupta period the king was undoubtedly recognized as the sole owner of the soil, at least in Bengal.[১৭]

## মধ্য যুগ

মধ্য যুগ : মুসলমান রাজা বাদশাহদের বিশেষ করে পাঠান সুলতান শের শাহ ও মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে বৃহৎ সুবে বাংলার প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা।[১৮] মধ্যযুগের ভূমির মালিকানার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের দুই শ্রেণীর অভিমত লক্ষ্য করা যায়।

১. প্রথম দলের মতে, এ যুগে বাংলায় ভূমির প্রকৃত মালিক ছিল প্রজা বা রায়ত। এ মতের সমর্থনে ড. ইসতিয়াক হুসেইন কোরেশী বলেন :
   "The peasant was the owner of his holding. The theory that the state was the owner of all land grew up during the period of anarchy and was not only too readily accepted by the British but was almost sponsored by them...During Muslim rule in the subcontinent the legal position that the peasant was the owner of his holding was never questioned. All contemporary literature bears this out; the Akin, the law books and the dastur-ul' amass are all unanimous on the point ...The ordinary peasants had all the rights which are associated with ownership."[১৯]

---

[১৪]. ড. আবদুল্লাহ ফারুক, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ.৪৫।
[১৫]. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ২২
[১৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
[১৭]. History of Bengal, Vol. 1., Ed by Dr. Majumder, P. 271
[১৮]. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
[১৯]. Dr. Ishtiaq Hussain Qureshi, *The Administration of the Moghul Empire*, India : Low price Publication, 1990, p176.

বদরুদ্দীন উমর বলেন :

"আইনত এবং কার্যত জমির ওপর রাষ্ট্র অথবা জমিদার জাতীয় কোন শ্রেণীর দখলী স্বত্ব মোগল আমলে ছিল না। জমির সত্যিকার মালিক তখন ছিল তারাই যারা নিজেরা গ্রামে কৃষি কার্যের দ্বারা জমিতে ফসল উৎপাদন করতো। কাজেই সে সময় যাদের জমিদার বলা হতো তারা ছিল সরকারের রাজস্ব আদায়ের এজেন্ট মাত্র, ভূস্বামী অথবা জমির মালিক নয়।"[২০]

২. দ্বিতীয় দলের মতে, এ সময়ে ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। সুলতান বা সম্রাটই ছিলেন রাষ্ট্রের সকল ভূমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে ড. এন. এ সিদ্দিকী, ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ, ড. লেনিন আজাদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ড. লেনিন আজাদ বলেছেন, "মোগল ভারতে জমিতে কৃষকের ব্যক্তি মালিকানা তো গড়ে উঠেইনি, এমনকি জমির উপর কৃষকের স্থায়ী বা জন্মগত কোন অধিকারই গড়ে উঠেনি, যে স্বত্বাধিকার তাদের ছিল, তা ছিল শর্তাধীন এবং রাষ্ট্র যে-কোন সময় কোনোরকম কৈফিয়ত ব্যতিরেকেই তা দখল করে নিতে পারতো।"[২১]

মধ্যযুগের বিশেষ করে মোগল আমলের ভূমি মালিকানা সম্পর্কে বিখ্যাত ফরাসি পরিব্রাজক বার্নিয়ের বলেন ঃ

"The land throughout the whole empire is considered the property of the sovereign, there can be earldoms, marquisettes or duchies. The royal grants consist only of pensions, either in land or money, which the king gives, augments, retrenches or takes away, at pleasure."[২২]

উভয় দলের বক্তব্য বিষয়কে পুঞ্জীভূত করে মধ্যযুগের বাংলার ভূমি ব্যবস্থায় মালিকানা ও স্বত্বের বিষয়টিকে অনেকেই একীভূত করার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে ড. সিরাজুল ইসলামের বক্তব্য হল, "Under the Mughal constitution, each group of landed interests had some kind of customary rights in land."[২৩]

---

২০. বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃ.১৭।

২১. ড. লেনিন আজাদ, *ভারতের সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো*, ঢাকা : ইউনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃ.৪১।

২২. Bernier's Travels in the Moghul Empire, Trans. By Archibald Constable, p,5.

২৩. Dr. Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation (1790-1819)*, Dhaka : Bangla Academy, 1979, p.6.

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগে বিশেষত সুলতানি ও মোগল আমলে বাংলায় ভূমিতে প্রজার তথা কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল।

## আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগ : ইংরেজ আমলে প্রণীত ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের বিশেষ করে ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ও ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এর আলোকে গৃহিত ভূমি ব্যবস্থা এবং সর্বশেষ পূর্ব পাকিস্থান বাংলাদেশ পর্বে ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯৮৪ সনের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ-এর প্রেক্ষিতে ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা।[২৪]

ইংরেজরা ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে ব্যবসায়ী চক্র হিসেবে এ দেশে এসেছিল। ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ছদ্মাবরণে তারা ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলার নবাব সুবেদার আজিম-উশ-শানের কাছ থেকে বার্ষিক ১১৯৫-৯৬ টাকা সেলামীর বিনিময়ে কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের তালুকদারী ক্রয় করে। কালক্রমে পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও নবাব মীর কাশিমকে পরাজিত করে বাংলায় ইংরেজ বিরোধী নবাবীর অবসান হলে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট এক চুক্তির বলে ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সম্রাট শাহআলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানের বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভ করে। এর ফলে এই তিনটি প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত হবার সুযোগ পায়। এভাবে রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে আবির্ভূত ইংরেজরা পরবর্তীকালে নানা ছলচাতুরী, কুটকৌশল ও ছোট বড় যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে ভারতবর্ষ অধিকার করে নেয়। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা রাজনৈতিকভাবে যে সুদৃঢ় অবস্থান তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভুত্ব অর্জন করেছিল তা তাদের ধীরে ধীরে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক আগ্রাসন বিস্তারের অনুকূল হয়েছিল।[২৫]

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে ভূমির মালিকানা ও স্বত্বের দাবিদাররূপে পাঁচ রকমের মধ্যস্বত্বের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে স্যার উইলিয়াম উইলসন হান্টার তাঁর বহু গবেষণালব্ধ 'Bengal MS. Records, Vol.I. এ উল্লেখ করেছেন ঃ

> 'The Records show that there were five different classes of claimants in the field. First, the Zaminder, or landholder in the laden sense of the term, who claimed a customary right (whatever might be the origin or actual incidents of that

[২৪]. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[২৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

right), to engage for the land revenue of a certain area...Second, the Talukdars, or intermediate holders between a Zamindar and the cultivators. Third, The revenue farmers, who had practically done the work of collecting the revenue in many Zamindaris and fiscal divisions (parganas) ...and who had acquired a certain prescriptive status, although not a prescriptive right equal to that of an old Zamindar. Fourth, military and other holders of lands, held rent revenue free, or at a low land tax, on the ground of services rendered to, or organist obtained from the Native Governments previous to the accession of the East India Company. Fifth, the holders of land, granted either free of revenue, or at a low land tax, for charitable, educational, or religious purpose; such as temple lands, mosque lands, Sanskrit college lands, and many others tenures of a like nature."[২৬]

আধুনিক যুগে ভূমিতে তিন ধরণের মালিকানা-স্বত্ব দেখা যায়। প্রথমত রাষ্ট্রীয়; দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত এবং তৃতীয়ত সম্প্রদায় বা সমাজের সমষ্টিগত মালিকানা। ব্যক্তি-মালিকানার রায়তী মালিকদেরকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

ক. উচ্চ শ্রেণীর রায়ত-মালিক
খ. মধ্যম শ্রেণীর রায়ত-মালিক
গ. নিম্ন শ্রেণীর রায়ত-মালিক।

অধিকন্তু আরও দু'টি শ্রেণীর ভূমি সম্পর্কিত জনগোষ্ঠীর অবস্থিতি এ যুগের কৃষি তথা ভূমি ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। এরা হল বর্গা জমির ধারক বা বর্গাদার। অপরটি ভূমিহীন কৃষক বা কৃষিনির্ভর মজুর শ্রেণী। উপরিউক্ত শ্রেণীগুলো সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো।

ক. প্রথমত উচ্চ শ্রেণীর রায়ত-মালিক–এই শ্রেণীর ভূমি মালিকগণ সরকারী দলিল-দস্তাবেজ তথা খাতিয়ান অনুযায়ী স্বনামে বেনামে বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক। এই শ্রেণীর মালিকগণ কাগজ-পত্রে ভূমি-স্বত্বাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভূমির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়।

[২৬]. W.W Hunter, *Bengal MS records, Vol. I,* London : W.H Allen & Co., 1894, pp.28-29.

খ. দ্বিতীয়ত মধ্যম শ্রেণীর রায়ত-মালিক-সেই শ্রেণীর ভূমির মালিক, যাদের নিজের নামে ভূ-সম্পত্তি বর্তমান, কিন্তু উক্ত ভূমি নিজেরা স্বয়ং ও ভাড়া করা কিষাণ দিনমজুর দিয়ে চাষাবাদ করিয়ে থাকেন। উপরে বর্ণিত এই দু' শ্রেণীর রায়ত-মালিক সম্পর্কে একটি রূঢ় অথচ বাস্তব কথা বলতে হয়, তা হচ্ছে এই যে, ভূ-সম্পত্তির স্বত্ব মালিকানা সম্পর্কিত প্রচুর মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ দলিল-দস্তবেজ কাগজপত্র এদের কাছে লভ্য।

গ. তৃতীয়ত নিম্ন বা দরিদ্র-শ্রেণীর রায়ত-মালিক-সরকারী দলিল-পত্রে বা অনেক সময় অর্থাভাবে বৈধ দলিল পত্র প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রিকরণ ছাড়াই এরা ভূমির মালিকানা অর্জন করে। এরা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষাবাদ করে এবং নিজস্ব সম্পত্তিতে জীবিকার ব্যয় সংকুলান না হওয়ায় অন্যের জমি বর্গা গ্রহণ করে এমন কি অন্যের জমিতে শ্রম পর্যন্ত বিক্রি করে।[২৭] মধ্যম শ্রেণীর রায়তদের সঙ্গে এদের প্রধান পার্থক্য 'A middle peasant does not need to sell his labour power while a poor peasant has to sell part of his labour power. This is the principal criterion for distinguishing between a middle and poor peasants.'[28]

উপরে বর্ণিত সকল শ্রেণীর রায়তই আধুনিক যুগে ভূমির মালিক হিসেবে গণ্য, যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন', ১৯৫০-এর অধীনে প্রণীত এস, এ (State Acquisition) খাতিয়ান (বাংলাদেশ ফরম নং ৫৪৬২)[২৯]

### উপসংহার

প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভূমির মালিকানা যাই থাকুক না কেন, বাংলার আধুনিক যুগের ভূমির মালিকানা ও স্বত্বাধিকার একান্তই ব্যক্তির। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তবে মালিকানা পূর্ণ ভোগ করার জন্য রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে চলা অপরিহার্য।

---

[২৭]. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ.১০১।

[২৮]. Quoted from' Dr. Utsa patnaik, peasant class Differentiation, *A study in Method with Reference to Haryana*, Delhi : Oxford UP, 1978, p.26.

[২৯]. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২।

## বুক রিভিউ

## Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law

লেখক ড. আব্দুল্লাহ্ আলবি হাজি হাসান। প্রকাশক : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ, পাকিস্তান। প্রকাশকাল ১৯৯৪ খ্রিঃ পৃষ্ঠা ২৮০, মূল্য : ২৫০ রুপি। বইটি একটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভের পরিমার্জিত সংস্করণ। তিনি মালয়েশীয় মুসলিম। অভিসন্দর্ভটি রচনাকালীন সময়ে তিনি মালয়েশিয়ার মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক ছিলেন। এ গবেষণাটি স্কটল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ (ম্যুর ইনস্টিটিউট) এর মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আই. কে. এ. হাওয়ার্ড এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়েছে। এটি সম্পাদনের সময়কাল ছিল সেপ্টেম্বর ১৯৮২ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। পিএইচডি সুপারভাইজার ড. হাওয়ার্ড ছাড়াও এডিনবার্গ ম্যুরে হাউজ কলেজ অব এডুকেশন এর ড. আর. ডগলাস অভিসন্দর্ভটির প্রথম খসড়া আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনের নির্দেশনা দিয়েছেন। লেখক তাঁর অভিসন্দর্ভটি রচনায় বিভিন্ন রেফারেন্সের জন্য এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন।

পরবর্তীতে মালয়েশিয়ার বেশ কয়েকজন মুসলিম স্কলার এটি পাঠ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সম্পাদনার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ যাইন উসমান, বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, মালয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. লুৎফি ইবরাহীম। এ ছাড়া অধ্যাপক তানসিরি দাতুক আহমদ ইবরাহীম, শায়খ, কলেজ অব ল, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি অব মালয়েশিয়া এবং সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু বকর, ইতিহাস বিভাগ, মালয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাকিস্তানের ড. মুহাম্মদ নাঈম, শিকাগো ইউনিভার্সিটির পিএইচডি ক্যান্ডিডেট মি. ড্যানিয়ের ব্রাউন প্রমুখ বইটি সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাদের দিক নির্দেশনানুযায়ী পরিমার্জনের পর এটি ইংরেজি ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বইটিতে মোট ১৩টি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম হচ্ছে –

- The Arabian Commercial Background in Pre Islamic Times (ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের বাণিজ্যিক পটভূমি)
- The Quran and the Commercial Life of Muslims (কুরআন ও মুসলিমদের বাণিজ্যিক জীবন)
- Good Manners, Decency and Ethics in Trade (ব্যবসায় নীতি, ভদ্রতা এবং নৈতিকতা)

- Management of the Market (বাজার ব্যবস্থাপনা)
- Voidable Contracts (বাতিলযোগ্য লেনদেন-চুক্তি)
- Risk in Sales and Permissible Sales (সাধারণ বিক্রয় এবং অনুমোদনযোগ্য বিক্রয়ে ঝুঁকি)
- Restriction on Sales (বিক্রয়ে বিধি-নিষেধ)
- Partnerships in Business Transactions and Al-Shufah (Pre-Emption) (ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশীদারিত্ব এবং প্রি-এম্পশন)
- ঋoans, Deposit and Al-Hajr (Interdiction)(ঋণ, আমানত এবং লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা)
- Al Kafalah (Suretyship) and Al-Rahn (Pledge or Security)(লেনদেনে জামিনদার হওয়া এবং বন্ধক রাখা)
- Al Ijarah (the Contract of Hiring) and Al-Ju'alah (Pay in Return for Work)(ভাড়া-চুক্তি এবং হারানো বস্তু ফিরিয়ে আনার বিনিময় প্রদান)
- Judicial Settlement of Disputes, Al-Sulh (Amicable Settlement) and Extinction of an Obligation, (ব্যবসায়িক লেনদেন ও চুক্তিতে উদ্ভূত বিরোধের বিচারিক নিস্পত্তি, সুলাহ বা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নিস্পত্তি এবং ঋণের দায় অন্যের উপর অর্পণ) এবং
- Conclusion (উপসংহার)

এ ছাড়া বইটিতে রয়েছে Forward, Preface, Transliteration Table, List of Abbreviations, Introduction to book, Notes, Bibliography Ges Index.

বইটিতে একটি ট্রানসলিটারেশন টেবিল সংযোজন করা হয়েছে। এতে আরবী অক্ষরগুলোর ইংরেজি বানান-বিধি, যা এই বইটিতে অনুসরণ করা হয়েছে, তার বিবরণ রয়েছে।

বইটিতে একটি দীর্ঘ এব্রেভিয়েশন লিস্ট রয়েছে, যেখানে মূলত যে বিরাট সংখ্যক গ্রন্থ রেফারেন্স হিসাবে বইটিতে ব্যবহৃত হয়েছে, লেখকের নামসহ তার সংক্ষিপ্তরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, Ham.*Sira* এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে Muhammad Hamidullah, *Sirah Ibn Ishaq* এর দিকে।

বইটির শেষে একটি দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জি রয়েছে, যেখানে এই বইটিতে ব্যবহৃত গ্রন্থাদির উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

আব্দুল বাকী, মুহাম্মদ ফুয়াদ, আল মুজামুল মুফাহারাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারিম, কায়রো, এন ডি.

আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আশআস আস্-সিজিসতানি (মৃত্যু ২৭৫ হিজরী), সুনান, চার খণ্ড, সম্পাদনাঃ মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ, কায়রো, ১৩৬৯/১৯৫০

আবু হানিফা, আন-নুমান ইবনে সাবিত (মৃত ১৫০ হিজরী), কিতাবুল আসার, তাঁর ছাত্র আবু ইউসুফ আশ-শায়বানির নামে ইমাম আবু হানিফার এই গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে- কিতাবু ফিকহিল আকবার, হায়দ্রাবাদ, ১৯৫৩ এবং জামিউ মুসনাদিল ইমাম আল-আ'যাম, যা সংকলিত হয়েছে মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ আল-খাওয়ারিজিমি (মৃত্যু ৬৬৫ হিজরী) এর মাধ্যমে, হায়দ্রাবাদ, ১৩৩২ হিজরী এবং মুসনাদুল ইমাম আবি হানিফা, সম্পাদিত হয়েছে সাফওয়াত আস-সাকা এর মাধ্যমে, হালাব, ১৩৮২/১৯৬২

এভাবে প্রায় দু' শ গ্রন্থের একটি দীর্ঘ তালিকা দেয়া হয়েছে, যেগুলো থেকে এই পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

বইটিতে প্রকাশকের ভূমিকায় ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর পক্ষ থেকে বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে, 'In his present book Dr. Abdullah Alwi Haji Hasan examines the business practices obtaining in the early period of Islam and highlights the legal principles which emerge therefrom. The author approaches the subject from the perspective of history, economics, law, market management, religion and ethics. As a result, a comprehensive study of the economic practices of early Islam has now become available in a fairly readable form'. অর্থাৎ 'বইটিতে ড. আব্দুল্লাহ আলবি হাজী হাসান ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যবসায়িক রীতিনীতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছেন এবং তা থেকে উদ্ভূত ব্যবসায় সংক্রান্ত আইনগত মৌলনীতিগুলোর উপর আলোকপাত করেছেন। লেখক বিষয়টিকে ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, বাজার ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় এবং নৈতিকতার দিক থেকেও পর্যালোচনা করেছেন। আব্দুল্লাহ আলবিও সহযোগীদের শ্রমসাধনার ফলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের অর্থনৈতিক রীতিনীতির উপর একটি ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা-কর্ম এখন পাঠকদের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে।' ... তবে প্রকাশকের মন্তব্যের পর আমরা বইটির অধ্যায়ভিত্তিক একটি পর্যালোচনা করে দেখতে পারি।

বইটির অধ্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মূল বইটির ভূমিকায় লেখক কেনাবেচার তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন, লেনদেন সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডকে বুঝাতে আরবীতে মূলত যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে বাই' (بيع)। লেখক বাই' শব্দটির শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এখানে আরো বলেছেন, যেহেতু বইটি কেনাবেচা বা লেনদেন (Contractual obligations or commerce and trade) সম্পর্কে, সেহেতু তিনি তাঁর আলোচনাকে এ ধরনের বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এর সঙ্গে হিবা (দান) অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি বিষয়গুলোর আলোচনা যুক্ত করেননি।

লেখক প্রথম অধ্যায়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নবুয়তলাভের অব্যবহিত পূর্বে আরব দেশে ব্যবসায়িক লেনদেন বা কেনাবেচা কী পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হতো বা সেগুলো সম্পর্কে কী ধরনের নিয়মরীতি প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলাম এ সব বিষয়ে নতুন কোন আইন তৈরি করতে চায়নি; চেয়েছে প্রচলিতগুলোর পুনর্মূল্যায়ণ এবং যথা সম্ভব সেগুলোর অনুমোদন। এ ক্ষেত্রে ইসলাম প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যা বা প্রয়োগকে কোথাও পুরোপুরিভাবে কোথাও আংশিকভাবে পরিবর্তিত করেছে অথবা পরিমার্জিত করেছে। লেখক দাবি করেছেন, তিনি মূলত এ বিষয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বিশেষ করে মক্কা ও মদীনায় প্রচলিত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক বলেছেন, ইসলাম আগমনের পর মক্কার জীবনে রসূলুল্লাহ স. এর উপর যে ওহী নাযিল হয়েছে সেগুলোর কিছু কিছু ছিল কেনাবেচা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত। তবে সেগুলো ছিল মূলত উপদেশ ও নীতি-নৈতিকতা ভিত্তিক, আদর্শিক আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন আইনগত নির্দেশনার সাথে সম্পর্কিত নয়। কুরআনের মাক্কী সূরাগুলো ঘোষণা করেছে যে, ইসলাম তার প্রারম্ভ থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক ব্যবসায়-বাণিজ্যে নৈতিক ও আইনী দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর মান (Standard) সম্পর্কিত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন যা সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী যুগের বাণিজ্য সম্পর্কিত আচরণের বিধিবিধানের মূল ভিত্তি ছিল, যা রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস সমূহে পাওয়া যায়। লেখক বলছেন, এই অধ্যায়টি ইসলাম সম্মত ব্যবসায়-বাণিজ্য বা লেনদেন সংক্রান্ত মোট ১২টি নৈতিক শৃংখলা কোড সম্পর্কে আলোচনা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক বাজার ব্যবস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, কোন পণ্য যদি আইনসম্মতভাবে বিক্রি করতে হয়, তাহলে অবশ্যই তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। তিনি বলেছেন, এ সব বৈশিষ্ট্যের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস প্রয়োজনীয় উপাদান পেশ করেছে। তবে পরবর্তী যুগের মুসলিম পণ্ডিতগণ এগুলোর আরো বিস্তারিত শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। এ

ছাড়া দাম নির্ধারণ, খাদ্যশস্য মজুতদারি, অধিক দাম দেয়ার প্রস্তাব করা (Outbidding), কেনার ইচ্ছা ছাড়াই অধিক দাম দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে প্রকৃত ক্রেতাকে সরিয়ে দেয়া, পণ্যের ত্রুটি গোপন রেখে ক্রেতাকে প্রতারিত করার চেষ্টা, সঠিক ভাবে ওজন করা এবং সঠিক ভাবে পরিমাপ করা, ব্যবসায়ীর অধিকারের সুরক্ষা এবং নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় ইত্যাদি বিষয়গুলো এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক 'খিয়ার' (خيار) বা কোনো পণ্য গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কিত এখতিয়ার দেয়া সম্পর্কে বলেছেন। এখানে এ ধরনের বিভিন্ন প্রকারের এখতিয়ার আলোচিত হয়েছে। যেমন খিয়ারে ফাস্‌খ, খিয়ারে মজলিস, খিয়ারে শর্ত, খিয়ারে আইব, খিয়ারে রুই'য়া, খিয়ারে গালাত ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক সাধারণ ও শরীয়ত অনুমোদিত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'গারার' বা ক্ষতির ঝুঁকি সম্পর্কে বলেছেন। এখানে কেনাবেচা বা লেনদেন সম্পর্কে ইসলামী আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতি (অর্থাৎ দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ কেনাবেচা বা লেনদেন করা যাবে না) কিভাবে আইন-বিজ্ঞানগত (Jurisprudential) দিক থেকে বিকাশ লাভ করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে 'গারার' বা ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনের শাব্দিক ও ইসলামী পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন, যেখানে বিক্রয়-পণ্য ক্রেতার সামনে অনুপস্থিত এবং ক্রেতা এর গুণাগুণ সম্পর্কে অনবগত, সেখানে এর ক্রয়-বিক্রয় ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস এবং ইসলামী আইনজ্ঞ ও মুজতাহিদের মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে লেখক ইসলামে যে সব পণ্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কম্যুনিটি বা সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় কোন সম্পদ, যেমন পানি একটি পণ্য যা সমাজের সকলের, সেখান থেকে কেউ ব্যক্তিগত সম্পদের মত করে পানি বিক্রয় করতে পারবে না। কেননা তা সমাজের অন্যান্য লোকের ক্ষতি সাধন করবে। এ ধরনের বহু বিষয় রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এগুলোর সঙ্গে এমন অনেক কাজ বা আচরণ জড়িত যা সমাজের জন্য অত্যন্ত চড়া মূল্য দেয়ার কারণ হতে পারে। যেমন উদ্বৃত্ত পানি এবং অন্যান্য কম্যুনিটি ভিত্তিক সম্পদ। হাদীসে এসেছে, কোন কূপে (নিজের ব্যবহারের পর) যে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত পানি থাকে, তা ব্যবহার করা থেকে মানুষকে বাধা দিও না। রসূলুল্লাহ স. যখন মদীনায় হিজরত করে আসলেন, সে সময় সেখানে একটি কূপ ছিল, যার মালিকানা ছিল ইহুদিদের হাতে। তারা সেখান থেকে পানি মানুষের কাছে বিক্রয় করতো। পরবর্তীতে হযরত উসমান রা. উক্ত কূপ তাদের কাছে থেকে ৩৫০০০ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নেন এবং সর্বসাধারণের জন্য তা উন্মুক্ত করে দেন। লেখক এভাবে পানি বা এ ধরনের অন্য কোন সামাজিক সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কে

ইসলামের নিষেধাজ্ঞা এবং এ ধরনের সুবিধা যেন সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় সে জন্য ইসলামের যে নির্দেশনা সে বিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

অষ্টম অধ্যায়ে লেখক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যবসা (যেমন মুদারাবা) এবং শুফআ বা প্রিএম্পশনের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান ও এ সম্পর্কে ইসলামী আইনজ্ঞ ও মুজতাহিদগণের ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ে মুদারাবা কী, মুদারাবার জন্য শর্তাবলী, মুদারাবার একাধিক পার্টির মধ্যকার মতদ্বৈততা (Dispute) এবং শুফআ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

নবম অধ্যায়ে লেখক ঋণ, আমানত ও কিছু কিছু ব্যক্তির কেনাবেচার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে ঋণ দেয়া এবং নেয়ার আরবী প্রতিশব্দ 'কারয' (قرض) এবং 'দাইন' (دين) এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ রেফারেন্সসহ আলোচনা করেছেন। তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলোর আইনগত বৈধতা সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করেছেন। ঋণ আদান-প্রদানের সময় সুদ দেয়া নেয়ার অবৈধতা সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন। ঋণ দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে কোন্ শর্ত আরোপ করা যাবে কোন্‌টি করা যাবে না সে বিষয়েও তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। যদি ঋণের অর্থ ফেরত দেয়ার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ ছাড়াই ঋণ দেয়া হয় তবে ঋণগ্রহীতা কতদিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করবে তা এখানে আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু অথবা মস্তিস্ক বিকৃত ব্যক্তি নিজে নিজে তার সম্পদের কোন রূপ লেনদেন করতে পারবে না মর্মে শরীয়তের যে বিধান রয়েছে সে সম্পর্কে অথবা দেউলিয়া ব্যক্তির লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে লেখক 'আল-কাফালা' (সিউরিটিশিপ বা জামিনদার হওয়া) এবং রাহ্‌ন্ (সম্পদ বন্ধক রাখা) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক এখানে এ সব পরিভাষার শব্দগত ও প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাধারণভাবে কোন ঋণ গ্রহণ করার বিপরীতে কোন ব্যক্তির ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে জামিনদার হওয়া অথবা ঋণগ্রহীতার কোন বস্তু ঋণদাতার কাছে বন্ধক হিসাবে জমা রাখা ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত ইসলামের দিক নির্দেশনা সম্পর্কে বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক এখানে আলোচনা করেছেন।

একাদশ অধ্যায়ে লেখক ইজারা বা ভাড়ার চুক্তি এবং জুআলা (হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার কাজের বিনিময়ে অর্থ পরিশোধ) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইজারা (إجارة) এবং জু'লা (جعلة) শব্দ দুটির আভিধানিক ও পারিভাষিক ব্যাখ্যা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইজারা কখন কোন্ শর্তে কার্যকর হবে সে সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে লেখক লেনদেনে কোনো বিষয় নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি এবং একজনের ঋণের বোঝা আরেকজনের কাছে হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে যখন কোনো জিনিসের কেনাবেচার কার্যকারিতা সম্পর্কে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়, কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করা না হয়, যেমন কত দাম, দাম পরিশোধের প্রকৃতি, দাম পরিশোধের জন্য সময় নির্ধারণ, বিক্রিত দ্রব্যের পরিমাণ ইত্যাদি এবং দু' পক্ষের কেউ যদি তার বক্তব্যটিকে সত্য বলে প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে উভয় পক্ষ শপথ করে এ মর্মে ঘোষণা করবে যে, প্রতিপক্ষ অসত্য বলেছে এবং সে নিজে সত্য বলেছে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রথম শপথ করবে এবং পরে ক্রেতা অনুরূপ শপথ করবে। এ অধ্যায়ে এ সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আবার কোনো ঋণের দাবি একজনের কাছ থেকে আরেকজনের উপর হস্তান্তর করা যায়, যাকে বলা হয় হাওয়ালা (حوالة)। এ সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বইটির আলোচনার উপর লেখক একটি নাতিদীর্ঘ উপসংহার লিখেছেন। উপসংহারে তিনি বলেছেন, বইটির দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে পাঠকগণ জানতে পারবেন কীভাবে রসূলুল্লাহ স. এর নুবুওয়তের তেইশ বছরে লেনদেনের চুক্তি বা ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত ইসলামী বিধিবিধান ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। বইটিতে এ বিষয়টিকে শুধু আইনের সীমার মধ্যে থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে আলোচনা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে, 'In the formulation and evolution of minute descriptions of this law, the Quran and the Traditions of the Prophet were regarded as the two binding and established sources for the purpose of re-evaluating, validating and reinstating the existing pre Islamic laws, whether local or foreign, or in order to introduce and promulgate new and undiscovered spheres of legal interpretation of commercial laws'..অর্থাৎ "ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত আচার-আচরণকে, সেটি আরব-অনারব যে রকমেরই হোক না কেন, পুনঃপর্যালোচনা করা, প্রামাণিকরণ করা এবং তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা অথবা ব্যবসায়িক বিধিবিধানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক উন্মোচন করা বা এতদসংক্রান্ত আইনগত বিশ্লেষণের অনুদঘাটিত বিভিন্ন দিক মানুষের সামনে উদঘাটন করার উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত অনুপুঙ্খ ইসলামী বিধিবিধানের সূত্রায়ণ এবং ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কুরআন এবং রসূলুল্লাহ স. এর হাদীসকেই একমাত্র আবশ্যিক এবং প্রতিষ্ঠিত দালিলিক উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।..."

বইটিতে একদিকে যেমন রয়েছে কুরআন এর আয়াতের উদ্ধৃতি, সাহাবীগণের বক্তব্যের উদ্ধৃতি, রয়েছে ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত আলিম, ফকীহ ও

মুজতাহিদগণের (যেমন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, শাইবানি, ইবরাহিম আল-নাখাঈ, ইবনে হাজার আল-আসকালানী, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন প্রমুখ) বক্তব্যের উদ্ধৃতি, তেমনি রয়েছে কিছু কিছু অমুসলিম প্রাচ্যবিদের গ্রন্থের রেফারেন্স। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, E. W. Lane রচিত Arabic English Lexicon, J. Schacht এর Gi An Introduction to Islamic Law এর Ges The Origins of Mohammedan Jurisprudence, W. M. Watt Gi Islam and the Integration of Society Ges Muhammad at Mecca and Muhammad at Medina এবং A. L. Udovitch এর Gi Partnership and Profit in Medieval Islam, Ges N. J. Coulson এর Gi A History of Islamic Law, Commercial Law in the Gulf States: The Islamic Legal Tradition ও Ges Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence প্রভৃতি।

এ সব প্রাচ্যবিদের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীরতার উপর আস্থা রাখার পরও একটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে। সেটি হচ্ছে, ইসলামের সকল বিধানের মতই ক্রয়-বিক্রয় ও এতদসংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিতে শরীয়তের যে বিধানাবলী রয়েছে এবং শরীয়তের আলোকে এগুলোর যে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে, সেগুলোর যেমন একটি পার্থিব আইনগত দিক রয়েছে, তেমনি সেগুলোর একটি ধর্মীয় দিক রয়েছে, যার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মুসলমানদের যাবতীয় কর্মতৎপরতা বা আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে বা হওয়া উচিত। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কেনাবেচা সংক্রান্ত কিছু কিছু আচরণ নাজায়েজ হবে, আবার কিছু কিছু আচরণ জায়েজ বা বৈধ হবে। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মুসলমানের আচরণের ফলে তার শুধু পার্থিব কেনাবেচাই সম্পন্ন হবে না, সাথে সাথে তার সওয়াব হবে এ বিশ্বাস মুসলমানদের রাখতে হয়। আবার যদি শরীয়তসম্মত ভাবে কেনাবেচা না করা হয়, অহলে গোনাহ হবে এবং আল্লাহর কাছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে -এ বিশ্বাসও মুসলমানকে লালন করতে হয়। কেনাবেচার এ সব বিধানের সঙ্গে কুরআন-হাদীসের সম্পর্ক আছে -এ বিশ্বাস মুসলমানকে রাখতে হয়। মুসলিম আলিম ও ফকীহ বা মুজতাহিদগণ এ সব বিষয় মনে রেখে এ সংক্রান্ত শরীয়তের বিধানগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছেন এবং সেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু অমুসলিম প্রাচ্যবিদের মধ্যে মুসলমানদের এ অনুভূতি থাকার কথা নয় এবং কেনাবেচা সংক্রান্ত ইসলামী বিধানাবলীর যে ধর্মীয় দিক রয়েছে সেটি তাঁদের মনে সক্রিয় না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তাঁরা এ সব বিষয়কে নিছক আইনী বিষয় বলেই হয়ত বা বিবেচনা করেছেন। এর সঙ্গে এগুলোর ধর্মীয় দিক বা অনুভূতির ব্যাপারটিকে তারা ঠিক কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং আলোচনার সময় সেগুলোকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন সেটি স্পষ্ট নয়।

অতএব বইটিতে কেনাবেচা সংক্রান্ত ইসলামী বিধিবিধান পর্যালোচনা করার সময় এ সব প্রাচ্যবিদের বক্তব্য গ্রহণ করা হলেও এ সীমাবদ্ধতার দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখা উচিত হবে বলেই মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, লেখক বইটিতে মূলত কেনাবেচা বা লেনদেন এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তি করা ও তার কার্যকারিতা, কার্যকারিতার শর্তাবলী ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বইটির মুখবন্ধে বলেছেন, তিনি মূলত ইসলামের প্রাথমিক যুগের অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে এ বিষয়ে যে ইসলামী বিধি-বিধান ও ব্যাখ্যা পাওয়া যেত সেগুলোর মধ্যে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে বইটির মূল আলোচনায় দেখা গেছে সেখানে সাহাবায়ে কিরামের যুগই শুধু নয় বরং তৎপরবর্তী যুগের তাবিঈ ও ইসলামী আইনজ্ঞ ফকীহ ও মুজতাহিদগণের আলোচনা বা ব্যাখ্যাও বিভিন্ন স্থানে সংযুক্ত করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, তিনি কোন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সে বিষয়ে উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা বা মতামত আলোচনা করেছেন তাঁদের কারো পক্ষ থেকে কোন উপসংহার বা সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য ছাড়াই; ফিকহের পরিভাষায় যাকে বলা হয় দমুফতাবিহি কওল' বা মন্তব্য। কোন মুফতাবিহি কওল এর উল্লেখ ছাড়া একেকটি বিষয়ের আলোচনা শেষ করার ফলে এখানে কোন সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে লেখক বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী ফকীহগণের মন্তব্য সন্নিবেশিত করেছেন। তবে কোন মাযহাবের ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উক্ত ব্যাখ্যার অনুকূলে মুফতাবিহি কওল উপস্থাপন না করায় ফলে বইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের উৎস হিসেবে সহায়ক হতে পারে। বইটির উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন ফাতওয়া দেয়া সঠিক হবে বলে মনে হয় না। কেননা তার জন্য একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের ব্যাখ্যা মুফতাবিহি কওল সহ উপস্থাপন করা, অথবা সকল মাযহাবের মতামত স্ব স্ব মাযহাবের মুফতাবিহি কওলসহ উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যা এখানে অনুপস্থিত। তবে সার্বিক বিবেচনায় বইটি কেনাবেচা এবং ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিস এবং মুসলিম ফকিহ ও মুজতাহিদের ব্যাখ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে প্রভূত সাহায্য করবে। সে হিসাবে রেফারেন্স বই হিসাবে এটি একটি উৎকৃষ্ট সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বইটির রেফারেন্স পদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য দিয়ে পর্যালোচনাটি শেষ করা যায়। বইটির প্রকাশক প্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট' রেফারেন্স উপস্থাপনের যে পদ্ধতি বইটিতে ব্যবহৃত হয়েছে তার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছে '...since the present book is likely to be used mostly by the readers who are more familiar with the style of citation and reference used in law books we have departed from the house style followed

by us in our publications....' অর্থাৎ 'আইনের পুস্তকাদিতে যে পদ্ধতিতে উদ্ধৃতি এবং রেফারেন্স উপস্থাপন করা হয় তার সঙ্গে অধিকতর পরিচিত পাঠকদের এই বইটি পাঠ করার সম্ভাবনাই অধিক বলে মনে হয়। সে কারণে আমরা আমাদের অন্যান্য প্রকাশনায় ব্যবহৃত রেফারেন্স পদ্ধতি থেকে এখানে সরে এসেছি এবং এখানে আইনের বইয়ের উদ্ধৃতির ধারা অনুসরণ করেছি।' বাস্তবিক পক্ষে বইটির রেফারেন্স পদ্ধতিটি অন্য ভাবে করা যেত। এখানে সমস্ত উদ্ধৃতির সূত্র বা বিবরণ বইটির শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি প্রতি অধ্যায়ের আলোচনায় ব্যবহৃত পুস্তকাদির সূত্র ঐ অধ্যায়ের শেষে দিয়ে দেয়া হতো, তাহলে পাঠকের জন্য সূত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজ হতো। পক্ষান্তরে বর্তমানে বইটিতে যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তাতে সূত্র খুঁজে বের করতে পাঠককে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

- মুহাম্মদ রাশেদ
সিনিয়র রিসার্চ অফিসার 'সার্চ'
SURCH (এ হাউজ অব সার্ভে রিসার্চ)

**শোকবাণী**

ইসলামী আইন ও বিচার (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা)-এর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রি. ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। আমরা তাঁর ইনতিকালে শোকাভিভূত। আমরা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। মরহুম ইসলামী শিক্ষা-আদর্শ এবং ইসলামী আইনের প্রচার ও প্রসারে যে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা সর্বান্তকরণে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং দু'আ করছি, যেন তিনি তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন।

# ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্‌ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যায়নপত্র জমা দিতে হবে-

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নালে মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রত্যায়নপত্র ছাড়া কোনো প্রবন্ধ গৃহীত [illegible]

গ. প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গবেষক জার্নালের ২ (দুই) টি কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোন বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র নিম্নোক্ত ভাবে লিখতে হবে।

**যেমন– গ্রন্থ :**

ক. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ.২৯

খ. ইমাম বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : ইসমু মানিইয যাকাত, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১১০

গ. যিকরা তাহা হুসাইন, *জামহুরিয়াতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ*, ওযারাতুস সাকাফা, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৭, পৃ. ১০৩

প্রবন্ধ ঃ

* Dr. Taslima Monsoor, *Dissolution of Marriages on Test A Study of Islamic Family Law and Women, Journal of the Faculty of Law*, University of Dhaka, Volume:15, Number:1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। *গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (Italic)* হবে যেমন, গ্রন্থ ঃ *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of Islamic law and judiciary*.

৭. আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলতি রীতিতে রূপান্তর করতে হবে, তবে রেফারেন্সদানের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবি, উর্দূ, বাংলা, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) টেক্সট দিতে হবে। Secondary source এর উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। **কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে–** আল-কুরআন, ২:১৫। **হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে–** ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায় (ابواب/كتاب): , অনুচ্ছেদ (باب):........, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, খ.--, পৃ.--। ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' অবশ্যই দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।


প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১২-০৬১৬২১, ০১৭১৭-২২০৪৯৮

ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

REG : NO : DA -6100, ISLAMI AIN O BICHAR : APRIL-JUNE : 2012



Design : **An-Noor**
01712310726, 01670037699